আত্মার বিপর্যয় ও তাঁর প্রতিকার



শাইখুল ইসলাম ড. তাহের আল-কাদেরী

আত্মার বিপর্যয় ও তার প্রতিকার
মূল : আল্লামা ড. তাহের আল-কাদেরী
ভাষান্তার : মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ
সম্পাদনা : আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক : মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী, সনজরী পাবলিকেশন, ৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট (২য় তলা), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, ফোন : ০৩১-২৮৫৮৫০৮

© সনজরী পাবলিকেশনের পক্ষে নুরে ফেরদৌস লিসা

প্রথম প্রকাশ : ০৬ জুলাই ২০০৯, ১২ রজব ১৪৩০, ২২ আষাঢ় ১৪১৬

মূল্য : ১৪০ [একশত চল্লিশ] টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান
মোহাম্মদীয়া কুতুবখানা
৪২, জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
আজকের সূর্যোদয় গ্রুপ (অফিস)
২৬ চামেলীবাগ, শান্তিনগর প্রধান সড়ক, ঢাকা-১২১৭

Atthar Biparjoy O Tar Protikar By: Allamah D. Taher AL-kaderi. Translated In Bengali By: Habib Sawqi. Edited By: Abu Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury. Published By: Mohammad Abu Tayeb Chowdhury. Price: Tk: 140/-



مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ
مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ
وَالْفَرِيْقَيْنِ مِنْ عَرَبٍ وَمِنْ عَجَمِ

﴿صَلَّى اللهُ تَعَالٰى وَعَلٰى وَصَحْبِهٖ وَبَارِكْ وَسَلَّمَ﴾

সূচিক্রম

প্রেক্ষাপট ৯
বর্তমান যুগের দুঃখবহ ট্রাজেডি ৯
চিকিৎসা-পদ্ধতি ১০
একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ১০
আল্লাহর জন্য যাত্রা ১২
আল্লাহর জন্য জেগে থাকা ১৩

প্রথম অধ্যায়

বিভিন্ন প্রকারের রূহানী রোগ ও তার কুরআনী চিকিৎসা ১৫
বর্তমান যুগের রূহানী রোগ ১৬
আত্মার রোগের দু'টি পদ্ধতি ১৬
চিকিৎসার কুরআনী নীতিমালা ১৬
মানবসত্তায় আত্মার গুরুত্ব ১৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

অন্তর-ব্যাধির প্রথম প্রকার :
আল্লাহ থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছেদ এবং তার কারণ ২১
আল্লাহ থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছেদের কারণসমূহ ২২
বন্দেগির সম্পর্ক জীর্ণ হয়ে পড়ার তিনটি পর্যায় ৩১
প্রথম ধাপ ৩১
দ্বিতীয় ধাপ ৩২
তৃতীয় ধাপ ৩২

তৃতীয় অধ্যায়

অন্তর-ব্যাধির প্রথম প্রকারের চিকিৎসা :
নেককারদের সান্নিধ্য ও আল্লাহর যিকির ৩৭
নেককারদের সান্নিধ্য ৩৮
কুরআনী নীতি ও নেককারদের সান্নিধ্য ৩৯
সুহবত সাহাবিয়াতের মূল ফাউন্ডেশন ৪০
সাহাবিয়াত : মর্যাদা ও বিশিষ্টতার শীর্ষবিন্দু ৪১
পানি-প্রাপ্তির পূর্বে চাই তৃষ্ণা ৪৩
রাত জাগরণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ৪৪
তাযকীয়া বা আত্মশুদ্ধি কী? ৪৪
আত্মশুদ্ধির পূর্বে আয়াত তেলাওয়াত করার হিকমত ৪৬
সুহবতের পুনরুজ্জীবন সময়ের একান্ত প্রয়োজন ৪৭
সুহবত বা সান্নিধ্য নুবুওয়তের প্রবাহ-পরম্পরা ৪৮

আমরা কতইনা কৃতঘ্ন! ৫০
অন্তর-ব্যাধির চিকিৎসার দ্বিতীয় মূলনীতি আল্লাহর যিকির ৫১
উপস্থিতি ও আনন্দের গভীর অনুভূতি ৫২
আল্লাহওয়ালাদের পরিচয় ৫৫
একটি ঈমানোদ্দীপ্ত ঘটনা ৫৬
যিকিরের গূঢ়ানুভূতি/বিশেষানুভূতি থেকে বঞ্চনা ও তার স্বরূপ-সন্ধান ৫৭
বিশেষাবস্থা ও পর্যবেক্ষণ তরীকত-পথের আলোকিত বাঁক ও মোড় ৫৭
এই ঔজ্জ্বল্য-মহিমা কতই না দীপ্তিকর! ৫৮
এক চমৎকার চিত্রায়ন ৫৯
মাওলানা রুমী (রহ) বর্ণিত একটি ঘটনা ৫৯

চতুর্থ অধ্যায়

অন্তরব্যাধির দ্বিতীয় প্রকার : হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে গোলামির সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং তার কারণসমূহ ৬৪
রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে আমাদের গোলামির সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কারণ ৬৫
প্রথম ফেতনা : বুদ্ধি-পূজা/বুদ্ধিবাদী মনোভাব ৬৭
মানুষি চিন্তার ভয়ঙ্কর ভ্রান্তি ৬৮
দ্বিতীয় ফেতনা : মনগড়া রেসালত-ভাবনার ওপর গেড়ে থাকা ৭০
ফেতনার স্বরূপ ৭০
তার স্বরূপ ছিলো আরো অন্য কিছু ... ৭১
হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যক্তিক মর্যাদা ৭২
রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পদমর্যাদাগত অবস্থান ৭৫
রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পদমর্যাদাগত অবস্থান ৭৭
আপাতদ্বন্দ্বের সমন্বয় হয় কীভাবে? ৮১
অমুখ্য বিষয়ে মেতে থাকার ফেতনা ৮৩
ঈমানের মধুরতা রাসূলের প্রেমের সাথে শর্তযুক্ত ৮৫
মুবাল্লিগদের ভয়ঙ্কর স্খলন ৮৬
ভালোবাসাহীন আমল দিয়ে সৃজিত তাকওয়া, স্বাদহীন ফলের মতো ৮৭
ফেতনার সূচনা ৮৭

নিজেকে নিয়ে যাও মোস্তাফার দরবারে ...	৮৯
পঞ্চম অধ্যায়	
অন্তরব্যাধির দ্বিতীয় প্রকারের চিকিৎসা দুনিয়া-ত্যাগ ও প্রেম-ভালোবাসা	৯২
দুনিয়াবিমুখতার পথ	৯৩
প্রেমের পথ ও দুনিয়াবিরাগের পথ : দু'য়ের মাঝে পার্থক্য আছে	৯৩
ইকবালের দৃষ্টিতে প্রেমের পথ পাড়ি দেওয়ার উপায়	৯৫
মাওলানা রুমীর (রহ) ঘটনা	৯৫
আল্লাহকর্তৃক মনোনিতকরণ (রাহে ইখাবত) ও আল্লাহর দিকে অভিমুখী হওয়ার (রাহে ইনাবত) মাঝে পার্থক্য	৯৭
একটি গুরুত্বপূর্ণ সূক্ষ্ম কথা	৯৮
'যুহদের পথ ও 'ইশকের' পথ বুঝার জন্য একটি যৌক্তিক উদাহরণ	৯৯
সাহাবাদের কর্মপদ্ধতি	১০০
সাহাবাদের গুণাবলির কুরআনী ক্রমবিন্যাস	১০১
সাহাবা ও তাবেয়ীনদের অভ্যাস-নীতি ও প্রেম নীতি	১০৫
রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিচ্ছেদ-বেদনায় একজন মহিলার কবিতাপাঠ শুনে হযরত উমর ফারুক (রা.) অসুস্থ হয়ে গেলেন	১০৫
হযরত বেলালের (রা.) মাহবুবের শহর ত্যাগ করার ইচ্ছা	১০৬
হযরত উসমানের (রা.) আমল	১০৭
সিদ্দীকে আকবর (রা.) ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভালোবাসা	১০৮
প্রেম-নীতি ও সিদ্দীকী আদর্শ	১০৮
হযরত আলী (রা.) ও রেসালতের সাথে তাঁর আদব	১০৯
সারকথা	১১০

প্রকাশকের কথা

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

আল্লাহর শোকর যে, আমাদের সন্‌জরী পাবলিকেশনের অন্যতম প্রকাশনা হিসেবে আমরা ড. তাহের আলকাদেরী প্রণীত 'ফসাদে কলব আওর উসকা ইলাজ' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ 'আত্মার বিপর্যয় ও তার প্রতিকার' পাঠককুলের কাছে উপস্থাপন করতে পেরেছি। আল্লাহর ওপর ভরসা করে যে হিম্মত নিয়ে আমাদের সংস্থা এদেশীয় মুসলমানদের আত্মিক, ধর্মীয় ও সামাজিকসহ সামগ্রিক মূল্যবোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিরলস কাজ করে চলেছে। এ গ্রন্থটি সে উদ্দেশ্য পূরণে যথেষ্ট সহায়তা করবে বলে আমাদের দৃঢ় আশা।

এ গ্রন্থটি আত্মিক সংশোধনকামী মানুষের জন্য দিকনির্দেশনা দিতে সক্ষম এবং এতে যথেষ্ট যুক্তি ও প্রমাণসহ এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। এ কারণে গ্রন্থটি প্রকাশনার জন্য নির্বাচন করে অতি অল্প সময়ে আমরা বঙ্গানুবাদটি পাঠককুলের নিকট পেশ করেছি। ইতিপূর্বেকার প্রকাশনাসমূহের ন্যায় এটিও পাঠকসমাজের কাছে সমাদৃত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

এর বঙ্গানুবাদ, প্রকাশনা ও বিতরণের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি মোবারকবাদ জানাই এবং মহান দয়াময় রাব্বুল আলামীনের কাছে সকলের কল্যাণ কামনা করি।

সালামসহ

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী

স্বত্বাধিকার, সন্‌জরী পাবলিকেশন, চট্টগ্রাম

সম্পাদকের নিবেদন

حَامِدًا وَّمُصَلِّيًا وَّمُسَلِّمًا

প্রবৃত্তি বা নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষমতা মানুষকে মানুষ্যত্বের উচ্চতম স্থানে বসায়। পক্ষান্তরে প্রবৃত্তির বশীভূত মানুষ অবস্থান করে সর্বনিম্ন স্তরে। প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণক এ মানুষগণ 'শুদ্ধ মানুষ' হিসেবে আখ্যায়িত ও সর্বত্র বরেণ্য হন।

প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রক হওয়াটা একজন মুসলমানের জন্য একান্ত জরুরি ঈমানী দাবিও। ইসলামের সোনালী যুগের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আশা করি উক্ত কথায় কেউ দ্বি-মত করবেন না। অথচ আজ আমাদের মধ্যে সে ক্ষমতা অনুপস্থিত কেন এবং বহুবিধ পন্থায় চেষ্টা-তদবির সত্ত্বেও তা হাসিলে আমাদের ব্যর্থতার কারণ কি এবং এ সমস্যার উত্তরণের পন্থাইবা কি –এসব অতীব গুরুত্ববহ বিষয়ে আল্লামা ড. তাহের আলকাদেরীর স্বভাবসিদ্ধ প্রামাণ্য ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনাসমৃদ্ধ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ 'আত্মার বিপর্যয় ও তার প্রতিকার' বাংলা ভাষাভাষী ভাইবোনদের জন্য পেশ করতে পারায় আমরা মহান আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করি।

গ্রন্থটিতে তরুণ ও উদীয়মান লিখক মাওলানা হাবিবুল্লাহ নিজ দক্ষতার ছাপ রেখেছেন বলে আমাদের ধারণা। তবে এতে কুরআনের আয়াতসমূহের যে বঙ্গানুবাদ দেয়া হয়েছে তাতে মূল উর্দু অনুসরণ না করে সংক্ষিপ্ত ও সহজ অনুবাদ দেয়া হয়েছে। এ নিয়ে পাঠক যেন ভুল না বোঝেন –তাই তা উল্লেখ করা হলো। অনুবাদক তাঁর কাজে আন্তরিকতার সাথে যে শ্রম দিয়েছেন তা গ্রন্থটি পাঠ করলে সহজে অনুধাবন করা যাবে। আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

গ্রন্থটি সম্পর্কে পাঠককুলের মতামত ও পরামর্শ প্রত্যাশা করি এবং তা যথাযথ বিবেচনারও অঙ্গীকার রইল। ভুল-ত্রুটি চোখে পড়লে তা আমাদের জ্ঞাত করানোর অনুরোধ রইল।

আল্লাহ তায়ালা সকলের শ্রমের উত্তম প্রতিদান দিন। আমিন।

সালামসহ

আবু আহমদ জামেউল আখতাব চৌধুরী

প্রেক্ষাপট

চারিত্রিক পতন, আধ্যাত্মিক অধঃপতন, জীবনাচরণের জীর্ণতা এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামি চিন্তাভাবনার অভাবের কারণে এবং মন-মস্তিষ্কে কুবৃত্তি ও বস্তুবাদের আক্রমণের কারণে আমাদের অন্তরাত্মা ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বাস্তবেই আজকাল শারীরিক রোগের চেয়ে রূহানী রোগের সংখ্যাই বেশি। রূহানী রোগের অবস্থা এমন যে, খুব কম মানুষই তার কবল থেকে রক্ষা পেতে পারে। উপরন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি হাজারো রোগে আক্রান্ত। আবার প্রত্যেকটি রূহানী রোগ ক্যান্সারের মতো রোগীকে নিজের পাঞ্জায় বেষ্টিত করে ফেলেছে। রূহানী রোগ যখন ভয়ঙ্করভাবে মহামারীর আকার ধারণ করে ধর্মের শরীরকে খেয়ে শেষ করে দেয়, তখন রোগীদের আধিক্য ও রোগের কাঠিন্য অনুপাতে তার চিকিৎসার চেষ্টাও হতে হবে বিশালাকারে ও ব্যাপকভাবে। সেই ঘূর্ণিঝড়ের মুকাবিলা করতে হবে সগুরুত্বে এবং স্বতন্ত্র ভিত্তিতে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, শারীরিক রোগের চিকিৎসার জন্য যত হাসপাতাল ও ক্লিনিক স্থপিত হয়েছে এবং প্রতিদিন হচ্ছে এবং এক্ষেত্রে যেসব পরিকল্পনা দৈনন্দিন হয়ে চলছে, এর তুলনায় রূহানী রোগ থেকে আরোগ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনা, ব্যবস্থা ও ক্লিনিক স্থাপন, বলতে গেলে শূন্যের কোঠায়। এক্ষেত্রে কোন দিক থেকে ইতিবাচক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাচ্ছে না। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় হলো- যেসব কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠান থেকে রূহানী রোগের চিকিৎসা যথাযথভাবে হওয়ার কথা ছিলো, সেইসব কেন্দ্র বা প্রতিষ্ঠান থেকেই রূহানী রোগের বিষাক্ত জীবাণু সংক্রমিত হচ্ছে ধর্মের শরীরে।

বর্তমান যুগের দুঃখবহ ট্রাজেডি

আজকের ব্যস্ততম বস্তুবাদী পৃথিবীতে প্রথমতঃ রূহানী রোগের দিকে মনোযোগ দেওয়ার এবং তার ক্ষতি অনুভব করার সময়ই নেই কারো কাছে। দ্বিতীয়তঃ মনোযোগ দিয়ে যদি তার জীবাণু থেকে বাঁচতেও চায়, তাহলে সত্যিকার মানুষের এই আকালের দিনে তার জন্য কোন চিকিৎসকের সন্ধান পাওয়া যায় না, যে তার আশুআরোগ্যের ব্যবস্থা করতে পারবে। তৃতীয়তঃ যেসব ভাগ্যবানদের অন্তর ও আত্মা প্রকৃত আলোয় আলোকিত হওয়ার অনুভূতি সৃষ্টি হয়, তারা সুচিকিৎসার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও অলসতা ও অসতর্কতা কারণে আশুআরোগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে বসে।

চিকিৎসা-পদ্ধতি

চিকিৎসা রূহানী হোক বা শারীরিক, তার কিছু বিশেষ নিয়ম-পদ্ধতি ও চাহিদা থাকে। চিকিৎসা যদি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী, তার সরাসরি তত্ত্বাবধানে এবং যথারীতিতে করা হয়, তাহলেই কাঙ্খিত ফলাফলের আশা করা যায়। আর যদি চিকিৎসকের কাছে আসা-যাওয়ায় অবহেলা করে, চিকিৎসাপত্র এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সেবন না করে এবং চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে চিকিৎসককে ঔষধের কার্যকরিতা সম্পর্কে অবগত না করে; বরং নিজের খেয়াল-খুশি মতে যদি ঔষধ সেবন করে, তাহলে চিকিৎসার কাঙ্খিত ফলাফল তো দূরের কথা, বরং সেই উদাসীন কর্মপদ্ধতির কারণে রোগ আরো বেড়ে যাবে বহুগুণে। তখন সেই অকার্যকারিতার দায়ভার না চিকিৎসকের ওপর বর্তাবে, না ঔষধের ওপর বর্তাবে। বাস্তব সত্য হলো- শারীরিক ব্যাধি তত বেশি গভীর, সূক্ষ্ম এবং ক্ষতিকর নয়, যত বেশি ক্ষতিকর রূহানী ব্যাধি। কারণ রূহানী ব্যাধি তো মানবতা ও ঈমানের ঘাতক।

একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা

সৃষ্টিকর্তার অপার করুণা যে, তিনি আমাদের মতো অধমদেরকে নিজের বান্দাদের রূহানী রোগের চিকিৎসার জন্য ছোট্ট একটি ক্লিনিক (মিনহাজুল কুরআন সংস্থা) প্রতিষ্ঠা করার তাওফীক দান করেছেন। যে প্রতিষ্ঠানের মৌলিক লক্ষ্য হলো চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক সংশোধন এবং তার সমূহ ব্যবস্থাপনার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। আল্লাহপ্রদত্ত এই তাওফীকের ওপর আমরা তাঁর কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতা পেশ করছি এবং কদমে কদমে তাঁর তাওফীক ও করুণায় সিক্ত হওয়ার জন্য মুখিয়ে আছি। মিনহাজুল কুরআন এমন একটি ক্লিনিক যেখানে আধ্যাত্মিক চিকিৎসাব্যবস্থার ওপর বিভিন্ন সেমিনার ও অনুষ্ঠান করে রূহানী রোগের চিকিৎসা করা হয়। এই চিকিৎসা থেকে যথাযথভাবে উপকৃত হওয়ার জন্য শর্ত হলো এই প্রশিক্ষণে নিয়মিত ও ধারাবাহিকভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। কারণ আমাদের অন্তরের অবস্থা বিকৃত হয়েছে ভীষণভাবে । আমাদের আত্মা আক্রান্ত হয়েছে কঠিন রোগে। আমাদের মর্মে মরিচিকা এতই বেড়ে গেছে যে, তা অল্প সময়ের উপস্থিতির কারণে ওঠে যাওয়া সম্ভব নয়। সেই সাথে সম্ভব নয় কলবের কালিমার মুছে যাওয়া এবং অন্তরের ময়লা দূর হয়ে যাওয়া। আমরা যদি চাই অন্তরের আয়নাকে পরিস্কার করতে, অন্তরকে ঈমানের আলোয় আলোকিত করতে এবং জীবনব্যবস্থাকে রূহানী বিপ্লবের সুবাসে সুশোভিত করতে তাহলে সেই

মজলিসে হাজির হতে হবে নিয়মিত ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে। মনে রাখতে হবে কোন বিশেষ ব্যক্তি এবং তার উপস্থিতিকে নিজের জন্য অতি-অপরিহার্য বিষয় করে নিতে হবে যাতে আমার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি সম্পর্কে প্রশ্নই করতে না হয়। কারণ আপনিও সঠিক চিকিৎসা পাবেন তার পক্ষ থেকে যার পক্ষ থেকে আমিও পেয়ে থাকি। অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সম্মানিত সত্তাই হলো সবার চিকিৎসক এবং সেই চিকিৎসায় বরকত বর্ধক। আল্লাহই সবকিছুর অধিকারী। তার ওপরই ভরসা করতে হবে আমাদের, আপনাদের ও সকলের।

বর্তমান যুগ হলো রূহানী রোগের যুগ। সেই রোগকে স্থায়ী করার জন্য বাইর থেকে শয়তান এবং অভ্যন্তরণীভাবে নিজের মন্দপ্রবণ মন (নফসে আম্মারা) সদাসর্বদা কর্মব্যস্ত রয়েছে। এসব মজলিস ও সুহবতের উদ্দেশ্য হলো ঘরে-বাইরের সকল শত্রুর প্রচেষ্টাকে পরাভূত করা। শয়তান ও মনের শিরদাঁড়া এমনভাবে ভেঙ্গে দিতে হবে যাতে তারা আর আমাদের ঈমানী দৌলত ও আত্মশুদ্ধির সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে। রূহানী প্রশিক্ষণের কয়েকটি মজলিসে ধারাবাহিক উপস্থিতির পর আপনি নিজেই অন্তরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে বুঝতে পারবেন, ধীরে ধীরে রূহানী রোগের শেকড় উপড়ে যাওয়া শুরু করেছে, মনের মরিচিকা ও অভ্যন্তরীণ চিন্তাবিক্ষিপ্ততা হ্রাস পেতে শুরু করেছে, রুহ নরম হয়ে আসছে, অন্তর-আয়না পরিস্কার হতে চলছে। উপরন্তু সে অনুধাবন করবে যে, অন্তরের কালো মেঘ ক্রমান্বয়ে কেটে যাচ্ছে, হালকা হয়ে যাচ্ছে কলবের বোঝা; সৃষ্টি হচ্ছে কল্পনার স্বচ্ছতা, ভাবনার পবিত্রতা, চিন্তার পোক্ততা ও বর্ণনার গ্রহণযোগ্যতা। আরো দেখতে পাবে, তার মন-মস্তিষ্কে শুরু হচ্ছে জাগরণ, আলোকিত হচ্ছে আত্মবিশ্বাস এবং ঠিকরে বেরুচ্ছে ব্যক্তিত্বের বিচ্ছুরণ। মোট কথা সমগ্র ব্যক্তিত্বজুড়ে সূচিত হবে এক দুর্দান্ত বিপ্লব। কবি কী চমৎকারই না বলেছেন,

হৃদয়ের জাগরণ হওয়া চাই উমরের (রা.) মতো,
চাই উসমানের (রা.) মতো,
আদম সন্তানের স্পর্শ-শাস্ত্রে
দিলের জাগরণই হলো আসল কিমিয়া।

কিন্তু একথাও মনে রাখা উচিত, চিকিৎসা যদি মনের ইচ্ছা মতে করা হয় এবং চিকিৎসকের দিকনির্দেশনা মোতাবে আমল করা না হয়, তাহলে রূহানী বৈঠকসমূহের বাস্তবিক উপকারিতা ও ফলাফল অর্জিত হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। রূহানী বৈঠকের মাধ্যমে অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসার যে

চারগাছ রোপন করা হয়েছে, তার সঠিক লালন ও প্রতিপালন নববী ফয়যান ও অলীদের তাওয়াজ্জুহ বা মনসংযোগের মাধ্যমে হয়ে থাকে। কিন্তু সেই ক্ষেতকে উর্বর করতে হলে দরকার আমাদের সততা, নিষ্ঠা ও উপস্থিতিতে ধারাবাহিকতা। এই চারা থেকে গজে ওঠা ফুল তথা আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসার সুবাস সুবাসিত করবে দিগ-গিগন্ত। সুবাস-বঞ্চিত কর্ণেরা ধীরে ধীরে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠবে। কারণ সেই সুবাসের মৌল লক্ষ্য হলো আত্মশুদ্ধি। আমরা যদি সততা ও নিষ্ঠার সাথে সেই কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করতে পারি, তাহলে হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর করুণা-সাগর এবং অলীদের রূহানী বরকত থেকে পরিতৃপ্তমান সেই ছায়াশীতল গাছ থেকে আমরাও নিজেদের অংশ পেয়ে যাব। কবির ভাষায়,

پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔

"পথের ধারে গজে ওঠা গাছ থেকেও বসন্তের আশা রাখতে পারো।"

আমরা যদি এই কেন্দ্রের সুতোয় গেঁথে থাকতে পারি, তাহলে রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফয়যের দানে আমরা ধন্য হবোই। এরকম হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ এই কেন্দ্রের নিসবত হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর জুতো মোবারকের সাথে সম্পর্কিত। আর এই কাজ শুধু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য শুরু করা হয়েছে। আমার দৃঢ় ঈমান রয়েছে, যে কাজের ভিত্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের ভালোবাসা ও আনুগত্যের ওপর হবে এবং যে চারাটি শুধু আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বতের সুবাস নেওয়ার জন্য রোপন করা হয়েছে, সেটি অবশ্যই ফল দিবে, ফুল ফোটাবে। যদি নিজের আবেগ-অনুভূতি ও অন্তরের অবস্থা জীবিত থাকে, তাহলে এসব রূহানী বৈঠক আপনার জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে নৈকট্য ও সমাদর অর্জনের কার্যকর মাধ্যমে পরিণত হবে।

আল্লাহর জন্য যাত্রা

আল্লাহ তা'আলার খাঁটি ও মকবুল বান্দাদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সফর করা এবং সফর করে আল্লাহ তা'আলার যিকিরে শরীক হওয়া অবশ্যই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। নিতান্ত নিষ্ঠাসহকারে যদি সফর করা যায়, তাহলে মাঝপথেও কবুলিয়তের সুসংবাদ পাওয়া যায়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "যখন কোন ব্যক্তি কোনে আল্লাহর বান্দার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছায় বের হয়, তখন একজন ফেরেশতাকে রাস্তায় বসিয়ে দেওয়া হয়। ফেরেশতা সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? সে বলে, অমুক ব্যক্তির কাছে যাচ্ছি।

সেই ফেরেশতা আবার প্রশ্ন করে, কেন আপনি ওর কাছে যাচ্ছেন? সে বলে, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির অর্জনের জন্য। ফেরেশতা তখন তাকে বলে, হে আল্লাহর বান্দা! আপনি মনে রাখুন আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত একজন ফেরেশতা। আমি এসেছি আপনাকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য। আপনি যেভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অমুক বান্দার সাথে ভালোবাসা জমিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলাও আপনাকে প্রিয় করে নিয়েছেন।"

উপরোল্লিখিত হাদীস দ্বারা আল্লাহ তা'আলার অসীম করুণা ও দয়ার কথা স্পষ্ট হয়েছে। যার দরুন খোদ বান্দা তার ভালোবাসার এমন এক স্তর পার হয় যাতে সে নিজেই আল্লাহর প্রিয় হয়ে যেতে পারে।

আল্লাহর জন্য জেগে থাকা

বান্দা যখন আল্লাহ তা'আলার যিকিরের মাধ্যমে আত্মপ্রশান্তি লাভের জন্য নিজের ঘুম ত্যাগ করে, তখন সে যেন রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর সেই সুন্নাতকে জীবিত করে, যা মাহবুবিয়াতের নিদর্শন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসায় রাত জেগে জেগে ইবাদত করতেন। তাঁর পা মোবারক ফুলে যেতো। যার আলোচনা আল্লাহ তা'আলা এভাবে করেছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ نِّصْفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾

"হে বস্ত্রাবৃত, রাত্রিতে দন্ডায়মান হোন কিছু অংশ বাদ দিয়ে; অর্ধরাত্রি অথবা তদপেক্ষা কিছু কম অথবা তদপেক্ষা বেশী এবং কোরআন আবৃত্তি করুন সুবিন্যস্ত ভাবে ও স্পষ্টভাবে।"[১]

কুরআন হাকীম আল্লাহর বান্দাদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলে,

وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَـٰمًا ﴿٦٤﴾

"এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়ে ও দন্ডায়মান হয়ে;"[২]

---

১. সূরা মুজ্জাম্মিল : ১-৫
২. সূরা আল-ফুরকান : ৬৪

আর তার যদি ঘুমিয়েও পড়ে তখনও তাদের অন্তর কিন্তু আল্লাহর যিকিরে সদমগ্ন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَـٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَـٰذَا بَـٰطِلًا سُبْحَـٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿١٩١﴾

"যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে, (তারা বলে) পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদেরকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও।"[৩]

যদি জাগ্রত থাকা যায়, তা শুধুই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির দিকে লক্ষ করে। আর যদি ঘুমও যেতে হয়, সেটা শুধু রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুন্নাত মনে করে। এমন জাগা ভাগ্যের জাগৃতি হয়। আর এমন শোয়া হয়ে যায় স্বর্ণতুল্য। এই শয়ন কবরের স্মরণ জাগ্রত করে। এই জাগরণের উদ্দেশ্য হলো জীবনের মূল উদ্দেশ্যের অনুভূতি মন-মস্তিষ্কে মজবুত করা। কারণ মুমিনের আসল উদ্দেশ্য তো পৃথিবীর সুখ-শান্তি কিংবা আখেরাতের আরাম-ফূর্তি নয়, বরং মুমিনের আসল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি। আর এই সন্তুষ্টি স্বপ্নে-জাগরণে আল্লাহ তা'আলার জন্য কষ্ট সহ্য করা ছাড়া অর্জিত হতেই পারে না।

৩. সূরা আলে ইমরান : ১৯১

প্রথম অধ্যায়

বিভিন্ন প্রকারের রূহানী রোগ ও তার কুরআনী চিকিৎসা

বর্তমান যুগের রূহানী রোগ

আত্মার রোগের তো বলতে গেলে বহু প্রকার রয়েছে। তবে আজকের সবচেয়ে বড় আত্মার রোগ যা আমাদেরকে ভীষণভাবে আক্রান্ত করেছে এবং যার কারণে আমাদের আত্মপরিশুদ্ধির অমূল্য ধন পর্যন্ত হারিয়ে যাওয়ার গুরুতর আশঙ্কা রয়েছে, সেটা হলো আল্লাহর সাথে আমাদের বন্দেগির সম্পর্ক ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে আমাদের গোলামির সম্পর্ক নামে মাত্র বিদ্যমান, কাজে ও বাস্তবে নয়।

আমাদের মাঝে আজ সমূহ অপকর্ম, ফিতনা ও ক্ষয়ক্ষতি এ কারণেই সৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের অন্তর এ কথার স্পষ্ট সাক্ষী দিচ্ছে যে, আমাদের থেকে আল্লাহর বন্দেগির সম্পর্ক কেটে গিয়েছে। আমাদের দিয়ে এখন বন্দেগির হক আদায় হচ্ছে না এবং এর প্রতি আমাদের কোন তোয়াক্কাও নেই। তেমনিভাবে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে আমাদের গোলামির সম্পর্ক আশ্চর্যরকমভাবে জীর্ণ হয়ে গেছে। আমরা এমনি তো রাসূলের অনুসরণ ও আনুগত্যের বড় বড় বুলি আওড়াই এবং তাঁর প্রেমের দাবি তুলি জোরে-শোরে। কিন্তু কাজে ও বাস্তবে নেই তার কোন ফলন ও প্রতিফলন। সার কথা, আজকের সবচেয়ে বড় ব্যাধি হলো এটাই। অর্থাৎ কাজে-কথায় অমিল। বুলির কাছে বাস্তবতা শিথিল।

আত্মার রোগের দু'টি পদ্ধতি

১. আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্কের বিচ্ছিন্নতা বা সম্পর্ক জীর্ণ হওয়া
২. কাজে-বাস্তবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গোলামি থেকে আমাদের দূরে সরে যাওয়া।

চিকিৎসার কুরআনী নীতিমালা

আত্মার রোগ নির্ণয়, কারণ চিহ্নিকরণ ও তার সঠিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে মৌলিক ও কার্যকর নীতি হলো কুরআনী নীতি। কুরআনী পদ্ধতি থেকে উদ্দেশ্য হলো সেই পদ্ধতি যা কুরআন নিজেই নির্ণয় করে দিয়েছে। সেই নীতিমালার কথাই আমরা আলোচনা করব, যা কুরআন মজীদ আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছে। আমরা প্রত্যেক জিনিসের সঠিক তথ্য জানার জন্য কুরআনের নীতি ও স্বীকৃতিই গ্রহণ করি। তবে কুরআন থেকে নীতি গ্রহনে ভ্রান্তি ঘটার আশঙ্কা থেকেই যায়। সেই ভ্রান্তি থেকে বাঁচার জন্য আমরা

রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুন্নাতকে দিকনির্দেশকের ভূমিকায় রাখি। আর সেই গবেষণা-পদ্ধতিকে চতুর্দিক থেকে পরিপূর্ণ করার পরে নিজের দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনের জন্য আমরা রাসূলের উম্মতের অলী-বুযর্গদের জীবনদর্শনের আশ্রয় গ্রহণ করি। যাতে করে মানুষের অপরিপক্ব জ্ঞান-বুদ্ধি ও কর্মপদ্ধতির কোন ভুল-ভ্রান্তি আমাদের গবেষণাপদ্ধতিতে সংক্রমিত না হয়। কুরআন-সুন্নাতের অধিক সমর্থন অলী-বুযর্গদের জীবন ও কর্ম থেকে নেওয়া সেই আয়াতেরই অনুকরণ, যেখানে আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে এই বলে দরখাস্ত পেশ করি যে,

اَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١﴾

"আমাদেরকে আপনি সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।"[৪]

'সঠিক পথ' যখন কুরআন-সুন্নাহর আকৃতিতে আমাদের সামনে পরিবেশন করা হয়, তখন সেই 'সঠিক পথ'কে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী সম্পূর্ণভাবে বুঝার জন্য পুনরায় তার কাছে আবেদন জানাই।

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿٧﴾

"সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ।"[৫]

ধর্মীয় ও রূহানী কাজের ক্ষেত্রে আমাদের গবেষণা ও কর্মপদ্ধতি তিনটি মূল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেগুলো হলো এই :

১। স্বীকৃতি বা সার্টিফিকেট কুরআন থেকে
২। সত্যায়ন সুন্নাতে নববী থেকে
৩। এবং সমর্থন অলী ও বুযর্গ থেকে

মূল সমস্যা এই হয়ে দাঁড়ালো যে, সবাই এই নীতিকে খণ্ডিত করে দেখছে। কেউ শুধু কুরআনকে গ্রহণ করেছে এবং কুরআনের মর্মার্থ বুঝার ক্ষেত্রে বুদ্ধির ঘোড়া দৌড়াচ্ছে। ফলে তারা পদে পদে স্খলিত হচ্ছে। কেউ আবার শুধু হাদীসকে গ্রহণ করেছে, কুরআনকে ছেড়ে দিয়েছে। আমরা কিন্তু সমূহ পদ্ধতির মিলন ঘটাতে চাচ্ছি, যাতে পৃথিবীজুড়ে কুরআনী নীতি আচরিত হয় এবং পৃথিবীবাসী কুরআনের পথে আগুয়ান হয়।

---

৪. সূরা ফাতিহা : ৬
৫. সূরা ফাতিহা : ৭

মানবসত্তায় আত্মার গুরুত্ব

মানুষের সত্তায় আত্মা হলো একটি শাসক শক্তি, যা মানুষের পুরো সত্তায় সদাসর্বদা নিজের কর্তৃত্ব গেড়ে রাখে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই শক্তিটি চিন্তা ও মস্তিষ্কের ওপরও বিজয়ী। মানবসত্তার বিভিন্ন অবস্থা তার অন্তরই নির্ণয় করে। মানুষের অনুভূতিশীল অঙ্গসমূহকে তখনই স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা যাবে যখন আত্মা এগুলোর বাস্তবায়ন করে। আর আত্মা যদি এসব গুণাবলি থেকে বঞ্চিত হয়, তখন অনুভূতিশীল অঙ্গসমূহ পূর্ণতার স্তর অতিক্রম করতে পারে না। এই বাস্তবতার সত্যায়ন কুরআন এভাবে করেছে,

خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰٓ أَبْصَٰرِهِمْ غِشَٰوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾

"আল্লাহ তাদের অন্তকরণ এবং তাদের কানসমূহ বন্ধ করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।"[৬]

বস্তুতঃ অন্তরের ওপর মোহর লেগে যাওয়ার কারণে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। ফলে সামগ্রিকভাবে তাদের কান বন্ধ হয়ে গেছে এবং তাদের চোখসমূহে কালো পর্দ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তাদের অবস্থা এই হয়ে দাঁড়ালো যে,

صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾

"তারা বধির, মূক ও অন্ধ। সুতরাং তারা ফিরে আসবে না।"[৭]

বাস্তব জিনিসটা যখন সে দেখে না, শুনে না, তাহলে সে বর্ণনা করবে কীভাবে? এই অবস্থাটি হলে মুমিনের জন্য খুবই হতাশাজনক। এই বিষয়টিকে কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে,

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَٰرُ وَلَٰكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ ﴿٤٦﴾

"বস্তুতঃ চক্ষু তো অন্ধ হয় না, কিন্তু বক্ষস্থিত অন্তরই অন্ধ হয়।"[৮]

৬. সূরা আল-বাকারা :৭
৭. সূরা আল-বাকারা : ১৮
৮. সূরা আল-হজ্ব : ৪৬

অর্থাৎ বাহ্যিক দৃষ্টিতে যেসব চক্ষু দৃষ্টিমান মনে হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে সে চক্ষুগুলো সত্যকে দেখা, সত্যের অনুভূতি জাগা ও সত্যের চাহিদা পূরণ করা থেকে অক্ষম হওয়ার কারণে সে চক্ষুগুলোকে দৃষ্টিহীন বলে ভ্রম হয়। আসলে সে চক্ষুগুলো অঙ্গ হিসেবে দৃষ্টিহীন নয়। তবে মানগত দিক দিয়ে একেবারে অন্ধ ও বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ অন্তরের লুকায়িত চোখ যখন অন্ধ হয়ে যায়, বাহ্যিক ও চামড়ার চোখও তখন অন্ধ হয়ে যায়।

যখন বুঝা গেলো যে, অন্তরের গুরুত্ব অপরিসীম। অন্তরে কোন বিকৃতি সাধিত হলে বাহ্যিক অঙ্গগুলো পর্যন্ত তাদের কার্যকারিতা থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে এ কথা আমাদের নিশ্চিতভাবে মেনে নিতে হবে যে, যদি অন্তরের অবস্থা দুরস্ত হয়ে যায়, তাহলে শরীরের সমূহ অঙ্গের কর্মক্ষমতা পূর্ণতা লাভ করবে। এই বাস্তব সত্যটিকে হাদীসে নববীতে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এভাবে বর্ণনা করেছেন,

أَلاَ إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ.

'নিশ্চয় শরীরে গোশতের এমন এক টুকরা আছে, যা সংশোধিত হলে; সমস্ত অঙ্গ সংশোধিত,আর নষ্ট হলে সমূহ অঙ্গ নষ্ট। সাবধান! সেই টুকরা হলো কলব বা অন্তর।'[৯]

যে কোন ব্যক্তির অন্তরাবস্থা যখন ভালো হয়ে যাবে, তখন তার ব্যক্তিত্ব প্রশংসার উপযোগী হবে। অন্তর যখন লোভ, অহংকার ও কুমনোবৃত্তির কালিমা থেকে মুক্ত হবে এবং ভালো কাজের আবেগ-উদ্দীপনায় ভরপুর হবে, তখন সে অন্তর নিজের অঙ্গসমূহের পথ ভালোর দিকে ঘুরিয়ে দেবে। তখন মানুষ 'সন্তোষভাজনের' স্তরে পৌঁছতে পারবে। যার দরুন সমাজে বয়ে যাবে ভালো ও কল্যাণের জোয়ার। পক্ষান্তরে অন্তর যদি রোগাক্রান্ত হয়, তাহলে মনের সমূহ অপকর্ম তার মর্যাদার সামনে পর্দা টেনে দিবে। ফলে তার ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়ে যাবে। তখন সে 'সর্বোৎকৃষ্টের' উঁচু স্থান থেকে নেমে 'সর্বনিকৃষ্টের' অতল গহ্বরে পতিত হবে। অতঃপর ছোঁয়াচে রোগের মতো অন্তরব্যাধির এই জীবাণুগুলো সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে সমাজ ও সমাজের সদস্যদেরকে আক্রান্ত করেই ছাড়বে। শুধু তাই নয়, বরং এই জীবাণুগুলো পুরো পৃথিবীকে আক্রান্ত করেই ক্ষান্ত হবে।

৯. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল মুসাক্বান, হাদীস নং, ১০৭। সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৫২। সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং. ৮৪

আমাদের চলমান যুগ পর্যন্ত উম্মতের অলী ও বুযর্গরা অন্তরব্যাধির চিকিৎসায় যেসব চেষ্টা চালিয়েছেন, সে সম্পর্কে কোন জ্ঞানী ব্যক্তিই অনবগত নন। সবাই এ সম্পর্কে ভালো করেই জানেন। কুরআন-সুন্নাহ্ থেকে নেওয়া তাসাউফের সমস্ত বিধান অন্তরব্যাধির চিকিৎসার জন্য এবং মানুষের বড়ত্বকে বাস্তবায়ন করার জন্য। আর এই বিধানাবলি অন্তরব্যাধির চিকিৎসার ক্ষেত্রে কুরআনের স্বীকৃতি ও সুন্নাহর সত্যায়নের ওপর প্রতিষ্ঠিত দৃষ্টিভঙ্গির জীবন্ত ও কার্যকর প্রমাণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অন্তর-ব্যাধির প্রথম প্রকার : আল্লাহ থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছেদ এবং তার কারণ

বর্তমান যুগে অন্তর-ব্যাধির সবচেয়ে বড় কারণ হলো, শয়তানের প্ররোচনা এবং মনের ধ্বংসাত্মক বস্তুবাদী মনোভাব। আজ আমাদের ঈমানী সম্পদ ভুলুণ্ঠিত। তবু আমরা আরামের ঘোরে এবং অলসতার নেশায় উন্মাদ। আজ খুবই প্রয়োজন গভীরভাবে আমাদের অন্তরের খবর নেওয়া। আমাদের অন্তর চিৎকার করে-করে বলবে, গোলাম তো গোলামি ভুলতে বসছে। কেউ যদি গোলামির জিঞ্জির পরে নেয়, তাহলে বাস্তব গোলামি তখনই ফুটে উঠবে যখন নিজের জান-মাল, ইজ্জত-আবরু থেকে শুরু সব কিছুর পূর্ণ অধিকার নিজের মুনিবকে দিয়ে ফেলবে। নিজের পূর্ণ অধিকার যখন মুনিবের হাতে সঁপে দিবে তখন নিজের কাছে আর কোন অধিকার থাকবে না। ফলে মুনিব তাকে কাঁদাক কিংবা হাঁসাক, খাবার দিক বা ক্ষুধার্ত রাখুক, সম্মানিত করুক বা অপমানিত, শান্তি দিক বা শাস্তি, সুস্থতা দান করুক বা অসুস্থতা সর্বাবস্থায় তিনি মুনিবই থাকবেন। গোলামের তো কোন অবস্থায় অভিযোগের কল্পনা হওয়াও সাজে না। এ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে আমরা নিজেকে একটু বিচার করে দেখি এবং নিজের চিন্তা, কর্ম ও জীবনাদর্শের পর্যালোচনা করে দেখি, তো আমাদেরকে নিতান্ত লজ্জা সহকারে এ বাস্তবতা স্বীকার করতেই হবে যে, আমরা আল্লাহর গোলামির নামে মাত্র দাবি ঠিকই করি, তবে নিজের আচরণে ও উচ্চারণে এর বিরোধিতা করে চলি।

আল্লাহ থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছেদের কারণসমূহ

আল্লাহ থেকে আমাদের সম্পর্ক-বিচ্ছেদের মূল কারণ দুইটি :

১। মনোবৃত্তি ২। বস্তুবাদিতা

এ কারণদ্বয় পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত। একদিকে রয়েছে আল্লাহর গোলমি এবং তার চাহিদাসমূহ। অন্যদিকে রয়েছে পৃথিবীর আকর্ষণ ও মনোলোভা মাধুরিমার দিকে প্রলুব্ধকারী প্রবৃত্তি। আজ আল্লাহর মুহাব্বত ও দুনিয়ার মুহাব্বতের মাঝে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত লেগেই আছে। সাথে সাথে সংঘর্ষ লেগে আছে আল্লাহর আনুগত্য ও মনের আনুগত্য এবং আল্লাহর গোলামি ও মনোবৃত্তির গোলামির মাঝে। আমাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে আমরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কোন দিকে যাচ্ছি। আমাদের বিবেকে কার মুহাব্বত, আনুগত্য ও গোলামির প্রভাব জায়গা করে আছে। আমরা ভালোবাসা-পরিচায়নের এই যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেছি। মনোবৃত্তির সমুদয় চাহিদা আমাদের কাছে প্রাধান্য পেতে বসেছে। আমরা সত্যিকার অর্থে আল্লাহর মুহাব্বতের বদলে নফসের মুহাব্বতের সয়লাবে ভেসে যাচ্ছি। আমরা

নিজেরাই মনের গোলামি ও আনুগত্যে নিজেকে জুড়ে দিয়েছি। আমরা আল্লাহর আনুগত্যের দাবি করি, তবে মন্দপ্রবণ কুপ্রবৃত্তির যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে কার্যতভাবে সেই দাবির বিরোধিতা করি। ফলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও দৃঢ়ায়নের আবেগ-উদ্দীপনা চাপা পড়ে গেছে এক অতল গভীরে। আমরা নফসের সামনে যেন সেজদাবনত হয়ে গেছি। যেন আমরা নফসেরই বান্দা। অবস্থাদৃষ্টে বোঝা যায় আমরা প্রকৃতপক্ষে তাকেই ইলাহ বানিয়ে নিয়েছি। শুধু বাহ্যিকভাবে আল্লাহর বান্দা হওয়া দাবি করি মাত্র। মানুষি মনের এই বাস্তব চিত্রটি কুরআন চিত্রিত করেছে এভাবে :

أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾

"আপনি কি তাকে দেখেন না, যে প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি আপনি তার যিম্মাদার হবেন?"[১০]

যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধি-বিধানের মোকাবিলায় নিজের নফস ও কুবৃত্তিকে প্রাধান্য দিয়েছে, আল্লাহর মুহাব্বত ও তাঁর যিকির এবং সৃষ্টির সেবা থেকে মুখ ফিরিয়ে পার্থিব স্বাদকে সজ্জিত করেছে এবং নিজের মনের চাহিদাকে সর্বোচ্চ স্থান দান করেছে, সে নিশ্চয় স্বীয় প্রবৃত্তিকে সেই স্থান দিয়েছে যা দেওয়ার ছিলো শুধু আল্লাহকেই। ইসলাম যেমনিভাবে দুনিয়াকে ছেড়ে দেওয়ার নাম নয়, তেমনিভাবে দুনিয়াতে ডুবে যাওয়ারও নাম নয়। ইসলামের দাবি হলো তোমরা যাই করো এবং যে কাজেই তোমরা ব্যস্ত থাকো, আল্লাহকে কিছুতেই ভুলতে নেই। তার ভালোবাসা যেন সদা-সর্বদা জাগ্রত থাকে তোমাদের অন্তরে। যদি তারই প্রেমের নেশায় তোমরা আপাদমস্তক ডুবে যাও, তাহলে তার আনুগত্য শনৈঃ শনৈঃ প্রিয় থেকে প্রিয়তর হতে চলবে। পৃথিবী তোমাদের জন্য কোন নিষিদ্ধ বস্তু নয়। আল্লাহ পাক নিজেই বলেন,

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ ﴿١٤﴾

[১০]. (সূরা আল-ফুরকান-৪৩)

"মানবকুলের জন্য অতি কমনীয় করে দেয়া হয়েছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আল্লাহ্‌র নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়।"[১১]

মনের চাহিদা, ইজ্জত-সম্মান, পদ-সম্পদ, সুখ্যাতির স্বাদ-উন্মাদনা ও পার্থিব জিনিসের প্রতি অসীম অনুরাগ –এগুলি আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দিয়েছেন একমাত্র পরীক্ষার জন্য। তোমাদেরকে এসব নেয়ামত দান করে তিনি পরীক্ষা নিতে চান যে, ঐশ্বর্যের নেশায় পড়ে তাকে কি তোমরা ভুলে যাচ্ছো, না কি ভালোবাসার আসনে স্থির রাখছো। যেমনিভাবে সুস্থতা-অসুস্থতা, ঠাণ্ডা ও গরম, আলো ও আধাঁরির মতো বিপরীতমুখী জিনিসগুলি সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেক জিনিসের মূল্য অনুধাবনের জন্য তেমনিভাবে বান্দার সামনে মনের চাহিদা, ইজ্জত-সম্মান, পদ-সম্পদ, সুখ্যাতির স্বাদ-উন্মাদনা ও পার্থিব জিনিসের প্রতি অসীম অনুরাগ রেখেছেন এবং সাথে সাথে আল্লাহর ভালোবাসা ও তার চাহিদাসমূহও রেখেছেন, যাতে ভালোবাসার দাবিদারকে কষ্টিপাথর দিয়ে যাচাই করা যায়, কতটুকু সে আল্লাহর আর কতটুকু অন্যের। কার ভালোবাসায় হৃদয় তার উদ্বেলিত। কার প্রেমে অন্তর তার উদ্দীপ্ত।

এখানে সবিশেষ উল্লেখ্য যে, মানুষকে বিবাহের হুকুম দেওয়া হয়েছে এবং এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে,

۞ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ ﴿١٨٩﴾

"তিনিই সে সত্তা যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র সত্তা থেকে; আর তার থেকেই তৈরী করেছেন তার জোড়া, যাতে তার কাছে স্বস্তি পেতে পারে।"[১২]

আল্লাহই যেন পুরুষের জন্য মহিলার ভেতরে এবং মহিলার জন্য পুরুষের ভেতরে আগ্রহ, শান্তি, ভালোবাসা ও অন্তরপ্রশান্তি গচ্ছিত রেখেছেন। সাথে সাথে এ কথাও বলেছেন,

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

[১১]. সূরা আলে ইমরান : ১৪
[১২]. সূরা আ'রাফ : ১৮৯

"যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তর সমূহ শান্তি পায়।"[১৩]

আল্লাহর যিকিরের স্বাদে যদি ডুবে যায় তাহলে স্ত্রী-সম্ভোগের স্বাদ কখনো মানুষ ভুলেও যায়। একদিকে সেই ভালোবাসা যার উৎস ও কেন্দ্র হলো স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক। অন্য দিকে সেই ভালোবাসা যার উৎস ও কেন্দ্র হলো আল্লাহ-বান্দা সম্পর্ক। এক দিকে স্বামীর সম্পর্ক। আর অন্য দিকে মালিকের (আল্লাহর) সম্পর্ক। একদিকে নফসের সম্পর্ক। আর অন্যদিকে আত্মার সম্পর্ক। এখন দেখতে হবে, কোন সম্পর্কটি বিজয়ী থাকে। যদি আল্লাহর সম্পর্ক বিজয়ী হয়, তাহলে বান্দাত্বের দাবি সঠিক। যদি স্ত্রীত্বের সম্পর্ক বিজয়ী হয়, তাহলে বুঝতে হবে আল্লাহর গোলামির দাবি শুধুই মুখের দাবি, যার কোন বাস্তব প্রমাণ নেই। সুতরাং দ্বীনের উদ্দেশ্য হলো স্ত্রীত্বের সম্পর্ক এবং তার চাহিদাসমূহ স্বস্থানে রেখে আল্লাহর ভালোবাসা ও সম্পর্ককে আত্মার ওপর বিজয়ী রাখা।

আল্লাহর ভালোবাসার পরম আধিক্য একটি হাদিসের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায়। এক দিন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর যিকিরে ও প্রেমে নিমজ্জিত ছিলেন, ঠিক সেই অবস্থায় হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

তুমি কে?

এ কথা শুনে হযরত আয়েশা (রা.) অস্থির ও অবাক হয়ে গেলেন। তিনি বললেন,

আমি আয়েশা।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

কোন আয়েশা?

এবারও হযরত আয়েশা ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি আবার বললেন,

আমি আবু বকরের মেয়ে।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

আবু বকর কে আবার?

হযরত আয়েশা আরজ করলেন,

আবু কুহাফার ছেলে

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

[১৩]. সূরা আর-রা'আদ- ২৮

আবু কুহাফা কে?
এ সব কথা শুনে হযরত আয়েশা ফিরে আসলেন,

এ প্রসঙ্গে কোন কোন বুযর্গ আরেকটি প্রশ্নও উল্লেখ করেছেন। তা হলো হযরত আয়েশা (রা.) মনে মনে ভাবলেন, এই সুযোগে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রশ্ন করবো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কে? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কী উত্তর দিলেন? হযরত শাহ পীর মেহের আলীর মতে হয়তো এমন উত্তর দিয়েছিলেন, যা একজন কবির ভাষায়:

'চুপে চুপে জেনে নাও একজন বুযর্গের উঁচুতা কত হতে পারে?'

বাস্তব সত্য হলো, মানুষ যখন পরম প্রিয়ের প্রেমে ডুবে যায়, তখন অন্য সবকিছু ভুলে যায়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর প্রেমে ডুবে যাওয়ার অবস্থা এক হাদিসে এভাবে বর্ণনা করেছেন,

لِيْ مَعَ اللهِ وَقْتٌ لاَ يَسَعُنِيْ فِيْهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلاَ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ.

"আল্লাহর সাথে আমার এমন কিছু মুহূর্তও কাটে যখন না কোন নিকটভাজন ফেরেশতা আল্লাহর কাছে কিছু বলতে পারে, না কোন বিশিষ্ট নবী উপস্থিত হতে পারে।"[১৪]

এ কথা নীতিগতভাবে সত্য যে, যেসব নেয়ামত আল্লাহ তা'আলা নিজের কোন প্রিয় নবীকে দান করেছেন। সেই নেয়ামতের কোন না কোন অংশ তাঁর উম্মতের মাঝেও বন্টন করেছেন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

"আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর জন্যে রহমতের তরে দোয়া কর এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর।"[১৫]

হযরত আনাস (রা.) বলেন, সাহাবাদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা.) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনাকে আল্লাহ তা'আলা যেসব নেয়ামতে ভূষিত করেছেন, সব কিছু থেকে

[১৪]. মিরকাতুল মাফাতীহ, খ. ১, পৃ. ৫৭
[১৫]. সূরা আহযাব : ৫৬

আমাদেরও কিছু কিছু অংশ মিলেছে, এখন আমাদের কথা হলো এই নেয়ামত থেকেও আমাদের কিছু মিলবে? এই প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ তা'আলা নিজের প্রিয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে দিয়েছেন,

هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَٰٓئِكَتُهُۥ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾

"তিনিই তোমাদের প্রতি রহমত করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও রহমতের দোয়া করেন-অন্ধকার থেকে তোমাদেরকে আলোকে বের করার জন্য। তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু।"[১৬]

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বৈশিষ্ট্যই যখন এই হলো যে, তাঁর অর্জিত সব নেয়ামতের কিছু কিছু অংশ উম্মতরা পাবেই। তাহলে মুসলমানদের অন্তর-গভীরে এ কথার দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই যে, তারা যদি পার্থিব মুহাব্বতের ওপর আল্লাহর মুহাব্বতকে প্রাধান্য দিতে পারে, তাহলে পরম প্রিয়ের প্রেমে হারিয়ে যাওয়ারও কিছু অংশ তারা অর্জন করবেই। তারাও সেই মধুরতা, প্রেম-ঝাঁজ ও আনন্দানুভূতি উপভোগ করবে, যার সামনে পার্থিব সমুদয় সখ ও স্বাদ পরাস্ত হয়ে যাবে। বুঝা গেলো দুনিয়ার কাজকর্ম এবং তার আকর্ষণ মানুষের সামনে রাখা হয়েছে শুধুই পরীক্ষার জন্য। যেন তাকে যাচাইয়ের পাল্লায় তুলে মাপা যায়। সে কি সৃষ্টির ভালোবাসাকে প্রধান্য দেয় আল্লাহর ভালোবাসার ওপর, না কি আল্লাহর ভালোবাসাকে প্রাধান্য দেয় সৃষ্টির ভালোবাসার ওপর। এই বাস্তবতাকে নিম্নোক্ত আয়াতে পরিস্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে,

ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ﴿٢﴾

"যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়।"[১৭]

অর্থাৎ কে আছে যে নিজের আমলকে 'হাসানের' স্তর থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে। আর কেইবা পারে এমন স্তরে পৌঁছে যেতে যেখানে তার

[১৬]. সূরা আহ্যাব- ৪২
[১৭]. সূরা মুলক- ২

সমূহ আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে। ইবাদত ও আল্লাহর স্মরণের ক্ষেত্রে 'ইহসানের' স্তর হলো যা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন,

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

"এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছো। আর যদি তাকে দেখতে না পাও, তাহলে একথার বিশ্বাস রাখবে যে, তিনি তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন।"[১৮]

ইবাদতের মধ্যে এটাই হলো সর্বোৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠতম পদ্ধতি।

মানবজাতির সামনে উভয় পদ্ধতি রাখা হয়েছে এবং তাকে বলে দেওয়া হয়েছে যে, হে আমার বান্দারা! আমি দেখতে চাই তোমরা সম্পদ-উপার্জনে এবং পার্থিব চাহিদাপূরণে যত কষ্ট সহ্য করো, তত কষ্ট ও যন্ত্রনা আমার ভালোবাসার জন্য সহ্য করছো কি না।

মানুষের যখন বিবাহ হয়, তখন স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য যাবতীয় কষ্ট করার জন্য এক পায়ে খাড়া থাকে। বাড়ি পরিচালনার জন্য আয়-উপার্জনে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতেও সাচ্ছন্দ্যবোধ করে। সন্তান হলে তাদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং উজ্জ্বল ভবিষতের চিন্তায় বিভোর হয়ে যায়। যাবতীয় পরিশ্রম করে চলে। মিথ্যা বলে। কখনো অপমানের গ্লানিও ভোগ করে। দোকানদার হলে সে লাভের চিন্তায় নিয়মিত হারিয়ে যায়। প্রতি মুহূর্তে শুধু স্বপ্ন দেখে আয়-উন্নতির। ভয়-ভীতি সর্বদা লেগেই থাকে ক্ষয়-ক্ষতির। অথচ অপরিণামদর্শী এই মানবজাতি সবকিছুর দাতাকে ভুলে গিয়ে তার দেওয়া বস্তুনিচয়ে ডুবে থাকে। আল্লাহর ভালোবাসা ভুলে গিয়ে পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ী জিনিসের মোহে মাতাল হয়ে যায়। কুরআন করীম ধমকির ভঙ্গিতে মানবজাতির সামনে আল্লাহর প্রেম-চাহিদার কষ্টিপাথর পরিবেশন করেছে,

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٤﴾

[১৮]. সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৫২। সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ১। সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, হাদীস নং ৪৬৯৫। সুনানুত তিরমীযী, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ২৬১০। সুনানে ইবনে মাজা, মুকাদ্দামা, হাদীস নং ৬৩ ও ৬৪।

"বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।"[১৯]

আত্মীয়তার সম্পর্ক, মাল-সম্পদ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য যেগুলোর চিন্তায় তোমরা সদা বিভোর, সেগুলো যদি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চেয়ে অধিক প্রিয়ে হয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে তোমরা অন্তরের দিক দিয়ে মুনাফিক। তোমাদের অন্তর আল্লাহর নাফরমানিতে নিমজ্জিত। দাওয়াতের কাজে কর্মরত দাঈদের জন্য এখানে চিন্তার বিষয় রয়েছে। এই আয়াত প্রত্যেক মুবাল্লিগকে ডেকে ডেকে বলছে, তোমরা তো নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকান-পাটের সাথে এমন মুহাব্বত রাখো যে, কোন গ্রাহক যদি গালিও দেয় তোমরা দোকান বন্ধ করে ঘরে বসে থাকো না। তোমরা কখনো বলো নি, দোকানদারিতে বড় অপমান, সেখানে আমি যাবোই না। বরং প্রয়োজনের চাপ এবং মালের মুহাব্বত যাবতীয় অপমানের গ্লানি সহ্য করেও দোকানদারিতে অবিচল রেখেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো পার্থিব প্রয়োজনের চাপ তোমাদের জন্য যে কোন অপমানকে সহ্যের উপযোগী করে তুলেছে। অথচ আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রয়োজনই অনুভব করলে না। কিংবা করলে, তবে এতটুকু নয় যাতে দ্বীনের পথে হাজির হওয়া যাবতীয় বিপদ ও অপমান অকাতরে সহ্য করে পারো। এখন পাল্লা তোমারই সামনে। এবার তুমি নিজেকে মেপে নিতে পারো যে, তুমি দ্বীনের তাবলীগের দাবি করেছো, তবে সেই পথে কষ্ট সহ্য করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করলে না। সেই পথে যখন কোন তিক্ততা, কোন ঠাট্টা কিংবা কোন শত্রুতার সম্মুখীন হলে, তখন অহঙ্কারের দাস হয়ে স্বার্থসিদ্ধির লোনা দরিয়ায় ঝাঁপ দিলে। যার ফলে হয়তো তাবলীগকে ছেড়ে দিচ্ছো কিংবা দীনের এমন ব্যাখ্যা মানুষের কাছে উপস্থাপন করছো, যা দ্বীনের প্রকৃত ব্যাখ্যা থেকে অনেক দূরে, শুধু মানুষকে খুশি করার লক্ষ্যে। আল্লাহর একান্ত প্রেমিক হয়ে যদি সেইসব কষ্ট সহ্য করা হতো, তাহলে ক্ষণস্থায়ী জীবনে কিছুটা কষ্ট-বিপদ কিংবা হিংসা-বিদ্বেষের তীরে বিদ্ধ হলেও আখেরাতের জন্য খুলে যেতো সৌভাগ্যের দ্বারখোলা প্রান্তর। কবির ভাষায়,

[১৯]. সূরা তাওবা : ২৪

پہنچ کر در پہ ترے کتنے معتبر ٹھہرے

اگرچہ راہ میں ہوئیں جگ ہنسائیاں کیا کیا

"যদিও পদে পদে কিছুটা কাঁটা বিধতে হয়েছে
তবু আমি ভাগ্যবান
কারণ আপনার দরবারে তো সফল হয়ে গেলাম।"

কখনো যদি আমরা নিজেদের ভেতরে সমাহিত হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করি- আমি কি আল্লাহর একান্ত প্রেমিক হওয়ার জন্য পৃথিবীর দশমাংশ কষ্টও সহ্য করেছি। নিশ্চয় উত্তর হবে না-বাচক। কারণ আল্লাহর মুহাব্বতের চাহিদাপূরণের ক্ষেত্রে আশু ফলাফল আমরা দেখতে পাই না। আল্লাহ তা'আলা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের জন্য পরীক্ষার বিষয় রেখে দিয়েছেন। চতুর্দিকেই স্রষ্টার মুহাব্বত এবং সৃষ্টির মুহাব্বতের মাঝে সংঘাত লেগে আছে। আজ আমরা বিবাহ বিষয়ে লক্ষ টাকা খরচ করতে সানন্দে প্রস্তুত। শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, শশুর বাড়ির সবাই যেন রাজি থাকে এবং একটি ভালো ঘর যেন মেলে। মানুষ যেন তার প্রশংসা করে। কিন্তু আল্লাহর নামে কিছু দেওয়ার নাম আসলেই সেখানে দুনিয়ার ভালোবাসা ও আল্লাহর ভালোবাসার মাঝে দ্বন্দ্ব লেগে যায়। এখানেই পরীক্ষা হয়, বান্দার অন্তরে দুনিয়ার ভালোবাসার পরিবর্তে আল্লাহর ভালোবাসা কতটুকুন প্রাধান্যপ্রাপ্ত। এখানে এসে বান্দারা গণনা শুরু করে। যা কিছু আগে দিয়েছে, তারও হিসেব করে। এটা হলো বান্দার বড় অজ্ঞতা। কারণ তিনিই সবকিছু দিয়েছেন বান্দাদের। আবার বান্দাদের কাছে চাইছেনও এভাবে,

إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَٰتِ وَأَقْرَضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾

" নিশ্চয় দানশীল ব্যক্তি ও দানশীলা নারী, যারা আল্লাহ্‌কে উত্তমরূপে ধার দেয়, তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ এবং তাদের জন্যে রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।"[২০]

কুরআন মজীদের অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা সেই ঋণ আদায়ে আরো সাতগুণ বেশি দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। তিনি বলছেন,

[২০]. সূরা আল-হাদীদ- ১৮

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّا۟ئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

"যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ করে দানা থাকে। আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ।"[২১]

কিন্তু বোকা বান্দাদের অবস্থা হলো এই, যার জন্য নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলীন করা দরকার ছিলো, তার জন্য সামান্য কিছু দিলেও সেটা হিসাব করে করে দেয়। প্রয়োজন তো ছিলো আল্লাহর জন্য অন্তরে শক্ত আসন স্থাপন করা। উপরন্তু কোন দুর্বলতা বা বাধ্যবাধকতার কারণে সেটা না পারলেও অন্তত দুনিয়ার জন্য নিজের যতটুকু ভালোবাসা দিয়ে থাকে ততটুকু আল্লাহর জন্য দিতো। কিন্তু অপরিণামদর্শী মানুষ তাও করতে পারছে না। আল্লাহ পাক বলেন,

إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

"নিশ্চয় সে জালেম-অজ্ঞ।"[২২]

বন্দেগির সম্পর্ক জীর্ণ হয়ে পড়ার তিনটি পর্যায়

যখন দুনিয়ার লোভ-লালসা এবং মনের কুপ্রবৃত্তি চরমে পৌঁছে যায়, তখন বন্দেগির সম্পর্ক জীর্ণ হয়ে পড়ার তিনটি পর্যায় মানুষ অতিক্রম করে।

প্রথম ধাপ

প্রথম পর্যায়ে আল্লাহ থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার পদ্ধতি বাহ্যিকভাবে হয়ে থাকে। তখন মানুষের অন্তরে কুপ্রবৃত্তির সয়লাব শুরু হয়। লোভ-মোহের কল্পনা তাকে বিষিয়ে তুলে। যুবতীর সৌন্দর্য দেখে, আকাশ ছুঁই ছুঁই প্রাসাদের চাকচিক্য দেখে এবং অত্যাধুনিক গাড়ির আভিজাত্য দেখে নিজের জিবও ভিজে ওঠে অজান্তে। প্রথম পর্যায়ে এসব কল্পনা ধীরে ধীরে

[২১]. সূরা বাকারা : ২৬১
[২২]. সূরা আহযাব : ৭২

মানুষকে প্রবল আকাঙ্খার দিকে নিয়ে চলে। জীবনে বাহ্যিক সৌন্দর্যপ্রীতি আল্লাহর ভালোবাসার ক্ষেত্রে 'কল্পনা-শিরক' জন্ম দেয়।

দ্বিতীয় ধাপ

দ্বিতীয় পর্যায়ে মানুষের অন্তরে তো আল্লাহর ভালোবাসা কোন রকম থাকে। তবে সেটা না থাকার বরাবর। এই পর্যায়ে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক নেই বলাটা ঠিক নয়। তবে সেটা থেকেও যেন নেই। এখানে এসে আকাঙ্খা একান্ত চাওয়ায় পরিণত হয়। মানুষ একই সময় দুইটির জিনিসের আকাঙ্খী হতে পারে না। এই পর্যায়ে এসে আল্লাহকে চাওয়া হ্রাস পেয়ে যায়। আর দুনিয়াকে চাওয়া প্রবল বেগে বেড়ে যায়। কারণ প্রেম হলো খুবই আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। যা কখনো এমন হৃদয়ে বাসা বাধে না, যা অন্যের প্রেমকেও তার সাথে শরীক করে। এই পর্যায়ে পৌঁছে মানুষের মন বহু মন্দ কাজে ডুবে যায়। যার মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হলো আত্মমর্যাদার চাহিদা। আত্মমর্যাদার চাহিদা যখন মানুষের অন্তরে গেড়ে বসে, তখন মানুষ শুধু চায়- অন্যরা আমার সম্মানে দাঁড়িয়ে যাক, আমার কদমবুচি করুক, আমার দাস হয়ে থাক এবং সর্বত্র আমারই প্রশংসার চর্চা করুক। ফলে দেখা যায় তার অন্তর থেকে আল্লাহর শান-মান এবং তার প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীলতা সমূলে নষ্ট হয়ে যায়। তার সাথে আল্লাহর সম্পর্কের ভিত একেবারে জীর্ণ হয়ে পড়ে।

তৃতীয় ধাপ

উপরিউক্ত চাহিদা যখন চরমভাবে বেড়ে যায়, তখন সেটা প্রচণ্ড লোভে পরিণত হয়। এ পর্যায়ে পৌঁছলে বন্দেগির সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে কেটে যায়। মানুষ যখন দুনিয়া এবং পার্থিব চাকচিক্যের পেছনে পড়ে যায়, তখন সর্বদা দুনিয়া অর্জন করার জন্য তার লিপ্সা ঝরতে থাকে। কুকুরের মতো তার জিহ্বা সবসময় ঝুলতে থাকে। কুরআন মজীদে এই অবস্থাটি চিত্রিত হয়েছে এভাবে,

وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِىٓ ءَاتَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَٰهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُۥٓ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ ۚ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَث أَوْ

تَتْرُكْهُ يَلْهَث ۚ ذَّٰلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا ۚ فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾

"আর আপনি তাদেরকে শুনিয়ে দিন, সে লোকের অবস্থা, যাকে আমি নিজের নিদর্শনসমূহ দান করেছিলাম, অথচ সে তা পরিহার করে বেরিয়ে গেছে। আর তার পেছনে লেগেছে শয়তান, ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়েছে। অবশ্য আমি ইচ্ছা করলে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিতাম সে সকল নিদর্শনসমূহের দৌলতে। কিন্তু সে যে অধঃপতিত এবং নিজের রিপুর অনুগামী হয়ে রইল। সুতরাং তার অবস্থা হল কুকুরের মত; যদি তাকে তাড়া কর তবুও হাঁপাবে আর যদি ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাবে। এ হল সেসব লোকের উদাহরণ; যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার নিদর্শনসমূহকে। অতএব, আপনি বিবৃত করুন এসব কাহিনী, যাতে তারা চিন্তা করে।"[২৩]

ধার্মিক শ্রেণীর ব্যক্তিদের কাছে যখন পার্থিব লোভ-লালসা অনেক বড় হয়ে দেখা দেয়, তখন তাদের এই অবস্থা বিশ্ববাসীর কাছে শিক্ষণীয় হয়ে থাকে। দ্বীনদার হোক বা দুনিয়াদার এই অবস্থাটি সৃষ্টি হওয়ার একমাত্র কারণ হলো লোভের কারণে সৃষ্ট অন্তর-ব্যাধি। যা আল্লাহর সম্পর্ককে সমূলে উৎখাত করে দেয়।

এই সত্যটির ইঙ্গিত করে হযরত আলী (রা.) বলেছেন,

اَلدُّنْيَا جِيْفَةٌ وَطَالِبُهَا كِلَابٌ.

"দুনিয়া হলো মৃত জিনিস যা শুধু কুকুররাই চায়।"[২৪]

দুনিয়ার লোভ-মোহের কারণে যাদের অন্তর ব্যাধিতে আক্রান্ত, তাদের সামনে এই বাস্তবতাকে স্পষ্ট করা দরকার যে, যেই ইজ্জত-সম্মান, সুনাম-সুখ্যাতি এবং পদ-মর্যাদার জন্য মানুষ আজ উন্মাদের মতো ঘুরছে এবং নিজের জীবন বিলিয়ে দিচ্ছে, সেগুলিও তো কোন এক সত্তার অনুগত। ফলে সেগুলি তাদেরকে ঘৃণা করে। কারণ তারা আল্লাহর মুখাপেক্ষিতা ছেড়ে আল্লাহর সৃষ্টির মুখাপেক্ষী হয়ে আছে। যেসব জিনিস পাওয়ার জন্য তারা পাগল হয়ে আছে, সেগুলি যদি তারা পেয়ে যায় তবু তারা লাঞ্ছিত। আর যদি না পায় তাহলে আরো চরমভাবে লাঞ্ছিত। আর যারা এসব জিনিস থেকে মুখ

---

২৩. সূরা আ'রাফ : ১৭৫-১৭৬
২৪. কাশফুল খফা, ১:৪৯২, কানযুল উম্মাল, ৩:২১৪

ফিরিয়ে শুধু আল্লাহর দিকে মুখিয়ে থাকে, সমস্ত জিনিস তাদেরকে ভালোবাসতে শুরু করে। দুনিয়ার তালেব যারা, তারা দুনিয়া তালাশ করতে থাকেথ। আর দুনিয়া শুধু আল্লাহকে তালাশ করতে থাকে। আর যখন আল্লাহর বান্দা আল্লাহর তালাশে বিভোর হয়, তখন কুরআন তার সম্মানকে দুনিয়াবাসীর কাছে এভাবে তুলে ধরে,

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُۥ ظَـٰهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَـٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَـٰبٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

"তোমরা কি দেখ না আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যাকিছু আছে, সবই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন? এমন লোকও আছে; যারা জ্ঞান, পথনির্দেশ ও উজ্জল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বাকবিতন্ডা করে।"[২৫]

দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবালের ভাষায়,

نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے
جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے

"তুমি তো জমিনের জন্য নও, নও তুমি আসমানের জন্য
তুমি পৃথিবীর জন্য নও, পুরো পৃথিবী তোমার জন্য।"

এটা হলো এমন স্তর যেখানে তালেবে দুনিয়া এবং তালেবে মাওলার প্রকৃত পরিচয় ফুটে ওঠে। কবির ভাষায়,

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے
مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہیں آفاق

"কাফিরের পরিচয় হলো, সে হারিয়ে গেছে পৃথিবীতে
আর মুমিনের পরিচয় হলো, পৃথিবী হারিয়ে গেছে তাতে।"

[২৫]. সূরা লুকমান : ২০

বান্দা যখন শুধু আল্লাহর হয়ে যায় এবং অন্য সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখন আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর সবকিছু তার পায়ে কুরবান করে দিতে প্রস্তুত। কবির ভাষায়,

ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں
راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں

"আমি তো সর্বদা দিতে রাজি, খোঁজার তো কেউ নেই,
পথ দেখাবো কাকে পথের সন্ধানী তো কেউ নেই।"

ইমাম নবহানী তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'কারামতে আউলিয়া'-এ বর্ণনা করেন, তালেবে মাওলা যে দিকেই চলেন, মেঘমালা সে দিকে চলতে থাকে। প্রচণ্ড গরমের দিনে মানুষ বলে, একটু যদি বৃষ্টি হতো! তখন আল্লাহওয়ালারা বলেন, আল্লার সাথে সম্পর্ক মজবুত করে নাও। যখন তারা ধনীদের থেকে নিয়ে দরিদ্রদেরকে দান করেন, তখন মানুষের প্রার্থনা কবুল হয়।

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ﴿٢٠﴾

"তোমরা কি দেখ না আল্লাহ্ নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যাকিছু আছে, সবই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন"[২৬]

উপরিউক্ত আয়াতের ভাষ্য যেন এই, হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহ পাক তকদীরের কলম তোমারই হাতে দিয়ে দিতে চান। তুমি প্রকৃত অর্থে আল্লাহর বান্দা হয়ে যেতে পারো কিনা দেখো, তখন তুমি যা হয়ে যেতে বলবে, তাই হয়ে যাবে।

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রাহ.) বলখের বাদশা ছিলেন। তিনি যখন আল্লাহর ভালোবাসার পেয়ালায় চুমুক লাগালেন, তখনই তিনি বাদশার আসন ছেড়ে বাইরে ছুটে গেলেন। একদিন তিনি সাগরের উপকূলে বসে কাপড় সেলাই করছিলেন। তাঁর পাশ তখন একজন মন্ত্রী যাচ্ছিলেন। মন্ত্রীর অন্তরে আসলো, হাইরে এ কেমন পাগল ! আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত ছেড়ে সাগরের তীরে একাকী বসে আছেন। মন্ত্রীর অন্তরে এ কল্পনা আসতে না আসতেই বাদশার অন্তরে জানা হলো। তিনি মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, দেখো আমি এই সূঁচ সাগরে নিক্ষেপ করে মাছদেরকে তা ফেরৎ আনার আদেশ করবো। মন্ত্রী সাহেব এই দৃশ্য স্বচক্ষে দেখলেন যে, হাজার হাজার

[২৬]. সূরা লুকমান : ২০

মাছ নিজেদের মুখে এক একটি সোনার সূঁচ নিয়ে হযরত ইবরাহীমের সামনে উপস্থিত। তিনি বললেন, আমার তো প্রয়োজন একটি মাত্র সূঁচের। তখন একটি মাছ ডুব দিয়ে তার সূঁচটি তালাশ করে দিলো। বাদশা বললেন, দেখো আমার সেই বাদশাহী শ্রেষ্ঠ না তোমার দেখা এই বাদশাহী? আমি যখন থেকে আল্লাহর বান্দা হয়ে গেছি, তখন থেকে সবকিছু আমার বান্দা হয়ে গেছে।

এখানে আসল কথা হলো, বান্দার সাথে যদি আল্লাহর সম্পর্কের ভিত মজবুত থাকে, তাহলে সব সৃষ্টির ওপর তার একচ্ছত্র আধিপত্য বা কর্তৃত্ব থাকে। আর এই সম্পর্ক যখন বিভিন্ন কারণে জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে পড়ে, তখন তালেবে দুনিয়া হয়ে সবার সামনে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়। কবির ভাষায়,

"হৃদয়ের বাদশাহী ও স্বাধীনতাই মৃত্যুর কারণ হোক কিংবা আত্মতৃপ্তির,
সিদ্ধান্তের অধিকার তোমারই হাতে, শান্তি হোক পেটের কিংবা হৃদয়ের।
নিজের মালিককেই যদি চেনা না হয়, তাহলে চিরদিন থাকবে বান্দার মুখাপেক্ষী,
আর যদি চিনে নিতে পারো মালিককে, তাহলে সবকিছুই করবে তোমার গোলামী।"

তৃতীয় অধ্যায়

অন্তরব্যাধির প্রথম প্রকারের চিকিৎসা

১। নেককারদের সান্নিধ্য
২। আল্লাহর যিকির

নেককারদের সান্নিধ্য

অন্তরব্যাধির মূল রহস্য ও তার কারণসমূহ স্পষ্ট করার পরে রোগনির্ণয়ের স্তর পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তারপর শুরু হয় চিকিৎসার পালা। চিকিৎসার মূল লক্ষ্য এই হয়ে থাকে যে, রোগীর শরীর থেকে রোগের প্রভাব, জীবাণু ও তার লুকায়িত ক্ষতিকর পদার্থসমূহ সম্পূর্ণভাবে দূর হয়ে তাকে পরিপূর্ণ সুস্থ করে তোলা। যাতে করে সে পুনরায় সফল, সচল ও প্রাণবন্ত জীবনযাপন করতে পারে। তার সত্তা পৃথিবীবাসীর জন্য উপকারী ও কর্মক্ষম হয়ে ওঠে। সে যেন নিজের চিন্তা ও কর্মের মাধ্যমে ফিরে পায় মর্যাদাময় জীবন। অন্তরব্যাধির চিকিৎসার মূল উদ্দেশ্যও একই রকম হয়ে থাকে। অর্থাৎ মানুষের সত্তা সমূহ রূহানী দুর্বলতা, পশুত্বের আধিক্য ও মনের উগ্রতা থেকে সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ হয়ে যায়। তার আত্মিক পবিত্রতা তার ভেতরে এমন এক শক্তি সৃষ্টি করবে, যার কারণে আল্লাহর সাথে তার বন্দেগির সম্পর্ক ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে গোলামির সম্পর্ক দৃঢ়করণের জন্য অস্থির হয়ে যায়। এতে করে তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভালোবাসার স্বাদ ও মধুরতা উপভোগ করা শুরু করে। ফলে তার দুর্ভাগ্য পরিণত হয় সৌভাগ্যে। তার অপমান পরিণত হয় সম্মানে। তার ভেতরের দুর্গন্ধ মেশকে আম্বরে পরিণত হয়। তার কলব ও আত্মা সুস্থতায় ধন্য হয়ে ইলাহী সম্পর্কের আলোয় ঝলমলিয়ে ওঠে। সেই আলোকোজ্জ্বল সত্তায় রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গোলামি সোনায় সোহাগা হয়। আল্লাহর সাথে বন্দেগির সম্পর্ক যখন কাজে ও বাস্তবে দৃঢ় হয়ে যায় এবং বাহ্যিকভাবেও যখন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তখন মানুষ 'তাসখীরের' মর্যাদায় ধন্য হয়। তখনই তাকদীরের আরোহী নিজের কলমের লাগাম মরদে মুমিনের হাতে সঁপে দেয়। ফলে তার অবস্থা এই হয় যে,

ہاتھ ہے اللہ کا بندۂ مومن کا ہاتھ
غالب و کار آفریں، کارکشاد، کارساز
خاکی و نوری نہاد بندۂ مولا صفات
ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز

اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل
اس کی ادا دلفریب اس کی صدا دلنواز

১। 'আল্লাহর হাত সে তো মুমিনরই হাত, সে হাত তো কার্যকর, কারিগর, বিজয়ী ও বিনির্মাণী।
২। আল্লাহর গুণে গুণান্বিত বান্দা তো মাটি ও নুর দিয়ে সৃষ্ট, তার ধনী দিল তো দুনিয়া-আখেরাতের প্রাপ্তি-আশা থেকে একেবারে বিমুখ।'
৩। আশা তার স্বল্প, তবে লক্ষ্য তার মহিমাকর
ব্যবহার তার সম্মোহনী, আওয়াজ তার মুগ্ধকর।

কুরআনী নীতি ও নেককারদের সান্নিধ্য

অন্তরব্যাধির চিকিৎসার ক্ষেত্রে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের ফর্মূলাটা সম্পূর্ণই কুরআন থেকে নেওয়া। যাকে স্বয়ং কুরআনই 'মিনহাজ' বলে নাম দিয়েছে। সুতরাং আমরাও সে নামে নাম দিয়েছি।

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴿٤٨﴾

"আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি।"[২৭]

কুরআন বুঝার জন্য আমাদের কাছে তাফসীরের নীতি হলো খোদ কুরআনী নীতিই। আমরা কুরআন থেকেই কুরআনী নীতি চয়ন করি। সেইসব নীতিকেই সজ্জিত করি, যা খোদ কুরআন পেশ করেছে। অন্তরব্যাধির চিকিৎসার জন্য কুরআনের প্রথম ও মৌলিক নীতি হলো সুহবত তথা আহলুল্লাহর সান্নিধ্য। মুসলিম জাতির আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধঃপতনের মূল কারণ হলো কুরআনী নীতিকে ছেড়ে দেওয়া। অনন্তর কুরআনী নীতি আমাদেরকে মুমিনসূলভ ও বীরসূলভ যে জীবনপদ্ধতি দান করেছে, তা আমরা সম্পূর্ণই ভুলে গিয়েছি। বর্তমান যুগে মুসলিম জাতির ডুবন্ত তরীর একমাত্র আশ্রয় হলো কুরআনী নীতির অনুসরণ। সেই অনুসরণ যথাযথভাবে প্রতিফলিত করা আল্লাহ ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভালোবাসার প্রথম ও প্রধান প্রমাণ। যেমনিভাবে আমরা কুরআনী নীতির দ্বিতীয় পদ্ধতি ভুলে গিয়েছি, তেমনিভাবে সুহবতের সবকও ভুলে গিয়েছি। আমরা আজ শুধু যে সুহবতের উপকারিতা সম্পর্কে অনবগত তাই

[২৭]. সূরা আল-মায়িদা : ৪৫

নয়, বরং বস্তুবাদিতার কর্তৃত্বায়নের ফলে কিছু কিছু লোকেরা সুহবতকে অস্বীকার করতে বসেছে এবং নিয়মিত তার নিন্দার জন্য ওঠেপড়ে লেগেছে। উপরন্তু সুহবতের কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন অবস্থাকে তারা পাগলপনা ও মাতলামি আখ্যা দিতে শুরু করেছে। অথচ কবির ভাষায়,

"উম্মতের জীবনে চাই প্রেমাকর্ষণ
বোকারা সেটাকে বলে পাগলামি।
এই আকাশের নিচে কখনো কি কোন জাতি
কিংবা দেখাতে পেরেছেন কোন জ্ঞানী
পাগলামি ছাড়া কোন কারিগরি?"

রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সান্নিধ্য যখন সাহাবাদেরকে 'জুনুনে যু ফুনুন' দান করলো, তখন সাহাবায়ে কেরাম মানবপৃথিবীতে এমন ব্যক্তিত্বে পরিণত হলেন যাদের দৃষ্টান্ত পেশ করা ইতিহাসের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। অন্তরব্যাধির চিকিৎসার মূল লক্ষ্য হলো আল্লাহর সাথে ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্ককে পুনরায় জোড়া লাগানো ও দৃঢ় করা। আর এই কাজটি সম্পাদিত হতে পারে একমাত্র সুহবতের মাধ্যমে। আল্লাহর ইশক-প্রেমের পথ এভাবেই খুলে। সুহবতের মাধ্যমেই ইশক ও প্রেমাকর্ষণের অনন্য অবস্থা সৃষ্টি হয অন্তরে। সুতরাং যেসব ব্যক্তিরা আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্য ছেড়ে দিয়েছে, তারা আল্লাহর বন্দেগির রহস্য বুঝে ওঠতে পারবে না। তারা সেইসব স্বাদ থেকে বঞ্চিত, যেই স্বাদ-উপভোগে মানুষের অবস্থা এমন হতে পারে যে,

"প্রাণের সঙ্গে যখন প্রাণের মিললো, অন্য এক প্রাণ সৃষ্টি হলো।
প্রাণ যখন ভিন্নতর হলো, পৃথিবীও তবে ভিন্ন হয়ে গেলো।"

সুহবত সাহাবিয়াতের মূল ফাউন্ডেশন

এ কারণেই মানুষে মানুষে মর্যাদার ভিন্নতা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যের দিক দিয়ে হয়ে থাকে। উম্মতের যে শ্রেণীর ভাগ্যে বেশি সম্মান জুটেছে, তাঁরা সাহাবী তথা সুহবতওয়ালা আখ্যায়িত হয়েছেন। সাহাবাদের জীবনে সবচেয়ে বড় মর্যাদার বিষয় হলো হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুহবত। তাঁরা তো রাতবিরাগী ছিলেন, তাহলে কেন তাঁদেরকে রাত জীবিতকারী দুনিয়াবিমুখ বলা হয় নি? তাঁরা তো বীরোত্তম ছিলেন, তাহলে কেন তাঁদেরকে প্রাণোৎসর্গকারী যোদ্ধা বলা হয় নি? তাঁরা তো বেশি বেশি তাহাজ্জুদ পড়তেন, তাহলে কেন তাঁদেরকে তাহাজ্জুদগুজার বলা হয় নি? তারা তো ছিলেন আল্লাহর রাস্তায় সবকিছু দানকারী, তাহলে কেনইবা

তাঁদেরকে দানবীর বল হয় নি? এসব গুণাবলি ও মর্যাদা স্ব-স্থানে ঈর্ষণীয়। তবে যার ভাগ্যে ঈমান অবস্থায় রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাক্ষাৎ নসীব হয়েছে, তার জন্য এর চেয়ে বড় কোন মর্যাদা ও সৌভাগ্য হতে পারে না। কারণ তার তো ঈমান ও ইসলামের সমূহ সম্পদ অর্জন হয়ে গেলো। আর ঈমান অবস্থায় রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দীদার নসীব হওয়ার কারণে দুনিয়ার আর কোন মর্যাদা তার সামনে কোন মর্যাদাই নয়। কারণ রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সান্নিধ্য ঈমান ও ইসলামের আসল মগজ। সুতরাং সাহাবাদের এই উপাধি ও মর্যাদা সুহবতের কারণেই।

সাহাবিয়াত : মর্যাদা ও বিশিষ্টতার শীর্ষবিন্দু

পৃথিবীজুড়ে এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, সাইয়িদুনা গাওছে আ'জম আবদুল কাদের জীলানী (রহ) বেলায়ত-রাজ্যের রাজপুরুষ। অলীদের মধ্যে তাঁর চেয়ে উচ্চ মর্যাদার কেউ নেই। কিন্তু পৃথিবীজুড়ে স্বীকৃত যে, সাইয়িদুনা আবদুল কাদের জীলানী (রহ) একজন অল্প মর্যাদার সাহাবীর সমপর্যায়ের হতে পারেন না। যে ব্যক্তি পুরো জীবন সৎ কাজে ব্যয় করার পর এবং শিরক ও কুফরীতে আপাদমস্তক ডুবে থাকার পর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে হাজির হয়ে ঈমান এনেছেন, তাঁর পুরো জীবনের আয়ই হলো রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুহবত বা সান্নিধ্য। অন্য কোন আমল তাঁর নেই। রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সান্নিধ্যে ঈমানসহকারে কিছুক্ষণ কাটানোর কারণে 'সাহাবিত্বের' যে মর্যাদা অর্জিত হয়েছে, সেই মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছা পৃথিবীর কোন অসাহাবী পীর-অলীর পক্ষে সম্ভব নয়।

কুরআনী নীতিমালার আলোকে সুহবতের স্থান এতটুকু যে, যে কোন সৌন্দর্য ও পূর্ণতা, সম্মান ও মর্যাদা সুহবতেরই ফয়য।

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا ۖ ﴿٢٩﴾

"মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবেন।"[২৮]

[২৮]. সূরা ফাতাহ : ২৯

এটাই তো নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সান্নিধ্যের একমাত্র প্রাপ্তি, যার কারণে সাহাবীদের হৃদয়-গভীরে সৌন্দর্য ও মহিমার শুভ মিলন ঘটেছে। ফলে
তাদের অবস্থা এই দাঁড়ালো যে, কবির ভাষায় :

"হৃদয়ের পরতে পরতে যার সুবাদে শীতলতা সৃষ্টি হবে,
সেটাই তো শিশির।
দরিয়ার দিল যে তুফানের কারণে উত্তাল হবে,
সেটাই তো ঝড়ো-হাওয়া, দ্রুত গতির।

তাদের মাঝে পরস্পরায়িত ভালোবাসা ও সৌহার্দ সৃষ্টি হয়েছে। সেই কারণেই তাঁরা পরম প্রিয়ের দরবারে রুকু ও সেজদায় প্রকৃত স্বাদ অনুভব করেন। তাঁরা রুকু করুন বা সেজদা করুন কিংবা আল্লাহর করুণার প্রার্থী হোন ইবাদতের অনুরাগ ও অভ্যাস কোথা থেকে পেলেন। এসব কিছু একমাত্র সুহবতেরই ফয়যান। তাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টি পেয়ে ধন্য হয়েছে একমাত্র সুহবতের কারণে। আর 'আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন' এই ঘোষণাও ঘোষিত হয়েছে একমাত্র সুহবতের কারণে। তাঁদের কপালে ইবাদতের চিহ্ন, তাদের ভাগ্যাকাশে সেজদার প্রতিচিত্র, তাঁদের কপাল থেকে ঝলকে পড়া আলোর বিকিরণ –এসবকিছুই ফয়যানে সুহবতের বরকতে।

আজ বস্তুবাদিতা ও মনোবৃত্তিপূজা মানুষের চোখে এমন পর্দা টেনে দিয়েছে, যার কারণে আমরা ভালো মানুষের পরিচয়ে থেকে বঞ্চিত। সুতরাং আমাদের আত্মা-ব্যাধির চিকিৎসা হলো যেখানেই কোন ভালো কিছুর আলোচনা হচ্ছে সেখানে গিয়ে বসা। সেই সান্নিধ্যকে সানন্দে ও সসমাদরে গ্রহণ করা। তাদের মধ্যে কেউ তো নেককার হবে, আবার কেউ বা আল্লাহর পরম নৈকট্যভাজন। আতর বিক্রেতার কাছে গিলে আতর কিনতে না পারলেও অন্তত সুগন্ধি তো পাওয়া যায়। অন্তত জীবন্ত হয়ে ওঠে তার ঘ্রাণশক্তি। হ্যাঁ, যদি সুগন্ধি মিলে যায়, তাহলে সুগন্ধির দিকে সফর করা প্রত্যয়ীদেরকে অবশ্যই ফুলের দিকে নিয়ে যাবেই। ইমাম আবু কুশাইরী (রহ) তাবেয়ীন ও প্রথম শতাব্দীর অলীদের সম্পর্কে বলেন, তাদের মধ্যে কেউ যখন অন্তর-আয়নায় মরিচিকা লেগেছে বলে মনে করতেন, ইবাদতের আনন্দে হ্রাস বা অনস্তিত্ব অনুভব করতেন, আধ্যাত্মিকভাবে কোন বিষয়কে নিজের ওপর ভারি মনে করতেন কিংবা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক কমে যাওয়াহেতু কোন পেরেশানি ও অস্থিরতা অনুভব করতেন, তখন তারা পরস্পর ডাকাডাকি করে বলতেন, আসুন ভাই ! একটু অমুক আহলুল্লাহর বৈঠকে বসি। অন্তরব্যাধির চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাদের এই পদ্ধতি থেকে প্রতিয়মান হয় যে, শুধু গিয়ে বসলেও সম্যসার সমাধান হয়ে যায়। সুহবতের কারণে সবকিছু নসীব হয়।

আল্লাহওয়ালাদের সুহবতে বসার ফলে ইশকে ইলাহীর তৃষ্ণা তো পেয়ে বসবেই।

পানি-প্রাপ্তির পূর্বে চাই তৃষ্ণা

নিয়ম হলো প্রথমে পানি নয়, প্রথমে চাই তৃষ্ণা। তৃষ্ণা যখন লেগে যায়, তখন পানির সন্ধান শুরু হয়। যখন সন্ধান ও কাঙ্খা সৃষ্টি হয়, তখনই কাঙ্খিতের জন্য শ্রম দেওয়ার মনোভাব জাগে। তবে এখানে মনে রাতে হবে তৃষ্ণা বাহ্যিকভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না। মানুষকে তাকে ছুঁতে পারে, না শুনে, না দেখে, না তার ঘ্রাণ নিতে পারে, না তার কোন স্বাদ উপভোগ করতে পারে। মোট কথা তৃষ্ণা মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নয়, তবে সেটি একটি বাস্তবসমর্থিত একটি বস্তু। যেসব লোক শুধু ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কোন জিনিসের বাস্তবতাকে বুঝতে চায়, তারা কোন জিনিস ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হলেই তার বাস্তবতাকে অস্বীকার করে বসে। অথচ বাস্তব জিনিস তো সেগুলোকেই বলে যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হয়েই অস্তিত্বমান ও বিদ্যমান। দুনিয়ার যে কোন ফল যেমন– আম-জাম, তরমুজ ও আপেল ইত্যাদি যে কোন ফলের ভেতরে বীজ, মগজ ও ছালসহ আরো বিভিন্ন অংশ থাকে। তবে ফলে যদি স্বাদ ও মজা না থাকে, তাহলে কখনো আমরা খাই না। একটি আমে ছাল, বীজ ও মগজ সবকিছু থাকলে সেটা আম হওয়ার মধ্যে কোন অভাব নেই। কিন্তু স্বাদ যেটা মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না, সেটা যদি না থাকে তাকে আমরা আম বলতে রাজি হই না। বুঝা গেলো স্বাদই আসল। স্বাদই মূল। স্বাদই বাস্তবতা। আর যেসব অংশ বাহ্যিকভাবে দৃষ্টিগোচর হয় সেগুলো রূপক বা পোশাক মাত্র। মূল জিনিস সেটাই যা দৃষ্টিসীমার বাইরে। আমরা কোন গ্রন্থে ফলের পর্যালোচনা পড়লে দেখবো, সেখানে ফলবিশেষজ্ঞরা ফলের প্রত্যেক অংশ নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু স্বাদের কোথাও আলোচনা করেন নি। কোথাও তাকে ফলের অংশ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি। অথচ বাস্তব সত্যি হলো যেটাকে অংশই মানা হচ্ছে না, সেটাই সবকিছুর মূল। ঠিক তেমনিভাবে মানুষ সম্পর্কে আমাদের স্থূল দৃষ্টি প্রতারণার শিকার হয়ে বসেছে। যাকে আমরা সর্বেসর্বা বুঝছি, সেটা মূলত কিছুই নয়। পৃথিবীর বুকে এই যে উঁচু উঁচু দালান, শারীরিক অঙ্গের গঠনসঙ্গতি ও চামড়ার সৌন্দর্য- এগুলি তো কিছুই না। সবকিছুর মূল হলো রূহ। অথচ রূহকে আজ আমরা গুরুত্বই দিচ্ছি না। খুব দুঃখ করে কবির কণ্ঠে বলতে হয়,

"মানুষের মূল তো রূহ। অন্য সবকিছু হলো বাহ্য রূপ।
রূহই আসল, তবে সেই রূহ যা পরমের জন্য চিরউৎসর্গিত।"

রাত জাগরণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

রাতযাপনের অনুষ্ঠানাদির উদ্দেশ্য হলো তৃষ্ণাকে উসকে দেওয়া। সন্ধানের আগুনে হাওয়া দেওয়া। সুহবতের কারণে পানি পাওয়া যাক বা নাই যাক, তবে তৃষ্ণা অবশ্যই সৃষ্টি হবে। আর তৃষ্ণা যদি সৃষ্টি হয়, তাহলে অন্য সবকিছুর ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তৃষ্ণা পেয়ে গেলে মানুষ এমনিতেই পানির সন্ধানে পাগল হয়ে যায়। অনেকে বলে, আমরা অনেক খুঁজেছি, কিন্তু কোন আল্লাহর বান্দা পাই নি। তাদের অভিযোগ এ জন্যই যে, তারা নিজেদের ভেতরে তৃষ্ণাকে তীব্রতর করা ছাড়াই আল্লাহর বান্দা তালাশ করে। তারা একথা ভালো করে জানে না যে, আল্লাহর বান্দা পেয়ে থাকে তারা নয়, তাদের তৃষ্ণাই। পানীয় যতই মূল্যবান ও মজাদার হোক, তৃষ্ণা যদি না থাকে তাহলে কোন মূল্য নেই। কারণ পানীয়টি স্বস্থানে মর্যাদাবান এবং তা নেয়ামত ও আত্মপ্রশান্তির উপাদান হওয়ার অস্বীকৃতি নেই কারো। তবে তৃষ্ণা না থাকলে তার মজা ও মূল্য বোঝা যাবে কীভাবে। আত্মার ব্যাধির চিকিৎসার ও রূহানী তারবিয়াতের জন্য কুরআনী নীতির প্রথম ধাপ হলো সুহবত। চিরজীবন্ত কিতাবই যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾

"আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও কাজের কথা শিক্ষা দেন। যদিও তারা ছিল পথভ্রষ্ট।"[২৯]

তাযকীয়া বা আত্মশুদ্ধি কী?

আয়াত তেলাওয়াতের পরে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানুষের আত্মা পরিশুদ্ধ করেন। যারা তাঁর সুহবতে আসে, তাদের আত্মাকে ঘষে-মেজে পরিস্কার করেন। এখানে চিন্তার বিষয় হলো –ধোয়া আর মাজার

[২৯]. সূরা আলে ইমরান : ১৬৪

মধ্যে পার্থক্য কী? এ প্রসঙ্গে আমরা বুঝতে পারি, কোন বাসনের ওপর যখন চর্বি বা ময়লা জমে, তখন বহু পানি ঢেলে দিলেও বাসন পরিস্কার হয় না, যতক্ষণ না বালি বা মাটি দিয়ে ঘষা-মাজা করা না যায়। কোন জিনিসকে যখন মাজা যায়, তখন কষ্ট হয়। শরীরে ব্যথা জাগে, চুলকায়। বাসনকে বালি দিয়ে কাদাযুক্ত করা হয়। বাসন যখন এই কষ্ট-সিরিজ পার হয়, তখন সে নামে-কামে-বাস্তবে পরিস্কার হয়ে ওঠে। ঠিক তেমনিভাবে আমাদের অন্তরকে যতক্ষণ না সুহবতের বালি দিয়ে ঘষা যাবে এবং তার অহংকার ও দম্ভকে নিঃশেষিত করার জন্য মাটি দিয়ে লেপা না যাবে, ততক্ষণ শুদ্ধ ও পরিশুদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়, সম্ভব নয় অন্তরব্যাধি চিকিৎসা হওয়া এবং রূহানী রোগের সংক্রামিক জীবাণু নিঃশেষিত হওয়া। আমরা চাচ্ছি, কষ্টও না হোক, ঘষার কাজও ঠিকভাবে হোক। আশ্চর্য কথা! আল্লাহর বান্দাদের একটু ঘষাও না পড়ুক আর এমনিতেই আল্লাহ মিলে যাবে! এটা কি হতে পারে? হাঁ কারো পরিশুদ্ধি যদি কোন আহলুল্লাহর একটি দৃষ্টি দিয়ে হয়ে যায়, তাহলে সেটা অন্য কথা। কিন্তু এই দানে ও গুণে ধন্য হওয়ার ব্যাকরণ হলো কষ্টের পাথুরে পথ পাড়ি দেওয়া।

যখন মানুষকে সুহবতের মাটি দিয়ে মাজা হয় এবং মানুষকে যখন মাটি-বালির মাঝে গড়াগড়ি দিতে হয়, তখন তার 'আমিত্ব' মরে যায়। ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায় তার অহংকারের ভূতগুলো। আর এই ভাঙ্গার কাজটিই হলো বিনির্মাণের মূল বুনিয়াদ। কবির ভাষায়,

"রুমী বলেন, কোন জিনিসকে আবাদ ও নির্মাণ করতে চাইলে
তাকে আগে ভেঙ্গে চুর চুর করে দাও।"

আত্মার ব্যাধির যথাযথ চিকিৎসার মাধ্যমে তার জীবাণুগুলোকে ধ্বংস করতে হবে প্রথমে। তার পরেই ব্যক্তির বিনির্মাণ শুরু হবে। শুরু হবে সেই ভাঙ্গন থেকে যা প্রেমের হাত ধরে আসে অস্তিত্বের আলোকিত প্রান্তরে। রুমীর ভাষায়,

"হে প্রেম! তুমি তো সমূহ রোগের মহৌষধ
তুমি খুশী হও,জীবিত থেকো, তুমি আমাদের পুঁজি।
তুমি জালিনূস, তুমি প্লেটো
অন্তরব্যাধির চিকিৎসা তুমি, তুমি আমাদের গুরু।"

মাওলানা রুমী (রহ) বলেন, হে প্রেম! তুমি জীবিত থেকো। তুমি আমার সমূহ ব্যাধির মহৌষধ। একমাত্র তুমিই পারো আমার মিথ্যা আমিত্ব, ভ্রান্ত সম্মানবোধ ও অযৌক্তিক বড়ত্বের ভূতকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করতে।

আমার নফসের ওপর যখন তোমার আঘাত পড়ে, তখন তার অস্তিত্ব টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ে। খাজা মুঈনুদ্দীন আজমীরী (রহ) বলেন,

"মর্যাদাবোধের কাঁচে তিরস্কারের পাথর ছুঁড়ে মারো।
তাকওয়ার ইজ্জতকে প্রেমের পথে চালিত করো।"

আত্মশুদ্ধির পূর্বে আয়াত তেলাওয়াত করার হিকমত

আল্লাহ তা'আলা নিজের প্রিয় নবী সম্পর্কে বলেছেন, তিনি আয়াত তেলাওয়াত করার পর প্রথমে মানুষের অন্তরকে সজ্জিত করেন এবং তারপর কুরআন মজীদ আরম্ভ করেন। কিন্তু আমরা এখন অন্তরকে সজ্জিত না করেই কুরআন পড়া শুরু করি। এটা তো শরীরে শুধু পানি ঢেলে দেওয়ার মতো, যাতে বাসনের উপর দিয়ে পানি তো চলে যাবে; কিন্তু বাসন পরিস্কার হবে না। যেসব ব্যক্তি হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুহবতে আসতেন, তারা ভেতরের আঁধারির সাথেই ঈমান কবুল করতেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের রূহানী চিকিৎসা ঘষা-মাজার মাধ্যমে করতেন না। তিনি আত্মশুদ্ধির কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করতেন। সেইসব আয়াতের আলো থেকে তাদের কাছে আলোর বিকিরণ পৌঁছুতো। তাদের ভেতরে আলো সৃষ্টি হতো। ভেতরে আলো সৃষ্টি হওয়ার পরেই তো আঁধারি স্পষ্টভাবে দেখা দেবে। সেই আলোর আয়নায় শিরক ও অন্যান্য গুনাহের আঁধারি দেখতে পাবে। লোভ-মোহ, মিথ্যাবাদিতা,মাল-সম্পদের প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও কুমনোবৃত্তির কীটপতঙ্গ স্পষ্টভাবে নজরে পড়বে। যখন তাদের বিবেকের আয়নায় নিজের গুনাহের সমূহ পঙ্কিলতা ধরা পড়বে, তখন তারা অস্থির হয়ে পড়বে যে, কীভাবে এই মনকে পরিস্কার ও পবিত্র করা যায়। গুনাহের আঁধারি দূর হওয়া, অন্তরমাঝে আলো সৃষ্টি হওয়া, মরিচিকা নজরে পড়া এবং মরিচিকা দূর করার জন্য অস্থিরতা সৃষ্টি হওয়া-এসবকিছু সেই পিপাসার দ্বিতীয় নাম যেই পিপাসাকে আমরা রাত্রিযাপন ও রাত্রিজাগরণের মাধ্যমে মেটাতে চাই। এই পিপাসা সুহবতের মাধ্যমে প্রবলতর হয়। যখন নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুহবত সাহাবাদের ভেতরে সত্যিকারের আবেগ, পিপাসা ও প্রেম-বেদনা সৃষ্টি করেছে, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দয়া, করুণা ও বখশিশের পেয়ালা তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। এখন আত্মশুদ্ধির স্তর অতিক্রান্ত হলো। আত্মা যখন পরিস্কার হয়ে গেলো, তাকে আল্লাহর কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেওয়ার সময় হলো। ফলে তাদের অন্তরের পাত্র এতই পরিচ্ছন্ন হলো যে, সেখানে এবার কুরআনের জ্ঞান ও হিকমাতের খাঁটি ও মিষ্ট দুধ ঢালার উপযুক্ততা সৃষ্টি হলো। প্রথমে কিতাব ও হিকমাতের শিক্ষা এজন্যই দেওয়া হয় নি যে, দুধ রাখার পাত্র পরিস্কার ছিলো না।

সুহবতের পুনরুজ্জীবন সময়ের একান্ত প্রয়োজন

আজকে আমাদের প্রধান প্রয়োজন হলো সুহবতের পুনরুজ্জীবন করা, যার কারণে তলব বা আল্লাহকে পাওয়ার প্রত্যাশা সৃষ্টি হবে। আর যখন এই প্রত্যাশা প্রবল পিপাসায় পরিণত হয়, তখন পানি সহজে মিলে যায়। আত্মার রোগের প্রতিকার প্রকল্পে সুহবতই হলো কুরআনী নীতিমালার প্রথম ভিত্তি যাকে শুধুই সূফীতাত্ত্বিক পরিভাষা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সুহবতের হুকুম স্বয়ং কুরআন এভাবে দিয়েছে,

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِىِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ﴿٢٨﴾

"আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহবান করে এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না।"[৩০]

আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পন্থা বলে দেওয়া হচ্ছে যে, তোমাদের যদি প্রয়োজন হয় আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি, তাহলে সেইসব ব্যক্তিবর্গের সান্নিধ্যে বস, যাদের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর স্মরণে ব্যয়িত হয়। যাদের সম্পর্ক আল্লাহ থেকে কখনো ছিঁড়ে যায় না। যাদের চিন্তা, কল্পনা ও আবেগ-অনুভূতির সূত্র আল্লাহর সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। যারা শয়নে-স্বপনে আল্লাহর স্মরণ ও আলাপচারিতায় মগ্ন থাকেন। তাদের একান্ততা বা কর্মব্যস্ততা আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ করে দিতে পারে না। যদি তোমরা আল্লাহকে পেতে চাও, তাহলে তাদের সান্নিধ্যে বস এবং তাদের দিকে নজর নিবদ্ধ করো। সুতরাং আল্লাহর সাথে তোমাদের সম্পর্ক শক্ত হয়ে যাবে।

"পানশালার আশে-পাশে ঘুরতে থাকো,
কিছু না পেলেও অন্তত সুগন্ধিটুকু পেতে পারো।
অথবা যদি সুগন্ধিটুকুও না পাও,
তাহলে অন্তত পানশালাটা একবার দেখে নাও।"

আল্লাহর প্রেমের পানশালার কাছে কাছে হলেও ঘুরো। হয়তো প্রেম-শরাব মিলেও যেতে পারে। যদি নাও মেলে তবে একটু সুগন্ধি হলেও তো পেয়ে যাবে। আর যদি ভাগ্যের ঘূর্ণাবর্তে অথবা নাকে সর্দি হওয়ার কারণে

---

৩০. সূরা কাহাফ: ১৮

সুগন্ধিটুকুও না পেয়ে থাকো, তাহলেও কোন বঞ্চনা নেই। কারণ তাদের কাছে যাওয়াটা একদিন নেশা ধরে যাওয়ার কারণ হবে। আল্লাহর বান্দারা যখন কারো ভেতর নেশা পেয়ে যাওয়ার যোগ্যতা লক্ষ্য করেন, তখন নেশার পাত্র তার সামনে পরিবেশন করার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। কুরআন আমাদেরকে প্রেমের কি চমৎকার পাঠ দিয়েছে দেখো :

وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ﴿٢٨﴾

"তুমি কখনো যেন তাদের থেকে ভালোবাসা ও মনোযোগের দৃষ্টি সরিয়ে না নাও।"[৩১]

নিজের মনকে তাদের সুহবতে অবিচল রাখো এবং চক্ষু তাদের দিকে স্থির রাখো। দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকো। কারণ তাদের চোখগুলো তো প্রিয়ের (আল্লাহর) দিকে নিবদ্ধ থাকে এবং তার জন্যই অশ্রু নিবেদন করে।

এই বাস্তবতার কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে নিজের নৈকট্য দান করার জন্য প্রথমে ব্যক্তি পাঠিয়েছেন, তারপর অবতীর্ণ করেছেন কিতাব। ব্যক্তি নির্মাণ ব্যক্তিই করতে পারে। নির্মাণের কাজটির জন্য সুহবত ছাড়া কোন উপায় নেই। দ্বীন বলার নাম নয়, করার নাম। নামাজের বিস্তারিত বিধান নাযিল হওয়া সত্ত্বেও সাহাবার যখন জিজ্ঞাসা করলেন, كَيْفَ نُصَلِّيْ আমরা নামাজ কীভাবে পড়বো? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তরে বললেন, صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي আমাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখো সেভাবে নামাজ পড়ো।[৩২]

যেন তিনি বলতে চান, আমাকে দেখো তাহলে তোমাদের নামাজ পড়ার কলাকৌশল শিখা হয়ে যাবে। কারণ দ্বীন অহেতুক বলার মাধ্যমে আসে না। সুহবতে বসার মাধ্যমে আসে। সুহবত হলো সেই সম্পদ যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পর প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে হস্তান্তরিত হয়েছে।

সুহবত বা সান্নিধ্য নুবুয়তের প্রবাহ-পরম্পরা

সুহবতই হলো নুবুয়তের এমন প্রবাহ, যা দ্বীন পাওয়ার একমাত্র উপায়। আজকে যদি আমরা দ্বীন ও তার মর্মার্থকে সঠিকভাবে বুঝতে চাই

[৩১]. সূরা কাহাফ : ১৮
[৩২]. সহীহ বুখারী, কিতাবুল আযান, হাদীস নং ৬০৫

এবং কথাকে কাজে পরিণত করতে চাই, তাহলে পুনরায় সুহবতকে জীবিত করতে হবে। কাজওয়ালাদের কাছে যেতে হবে। তাদের অবস্থা স্বচক্ষে পর্যবেক্ষন করতে হবে। তাদের চেরাগ থেকে নিজের চেরাগ জ্বালাতে হবে। কারণ চেরাগ জ্বালানোর জ্ঞান থাকা এবং দেয়াশলাই পাশে থাকাই যথেষ্ট নয়। যতক্ষণ না দেয়াশলাই জ্বেলে চেরাগে আগুণ ধরিয়ে দেওয়া যাবে, ততক্ষণ জ্বলে ওঠবে না চেরাগ। সুহবতই ব্যক্তিত্ব নির্মাণ করে। সুহবতই বিপ্লবের ভিত্তি। কবির ভাষায়,

"সুহবতই পাকা করতে পারে প্রত্যেক কাঁচা জিনিস।"
একটি বড় দল যেমন ঘাতে পারে একটি বিপ্লব।"

মাওলানা রুমী (রহ) মসনভীতে একজন আরব বাদশাহর কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এই বাদশাহ শক্তি, প্রতিপত্তি ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। শারীরিকভাবেও তিনি ছিলেন সুন্দর। এক রাতে ঘুমের মধ্যে তাকে পেয়ে বসল প্রকৃত প্রেম আল্লাহর প্রেম। তার অন্তরে জ্বলে ওঠে আল্লাহর প্রেমের আগুন। তিনি নিজের রাজত্ব ও বড়ত্ব ছেড়ে তাবুকে চলে গেলেন। তিনি সেখানে মাটির বাসন তৈরি করে বিক্রি করতেন। চেহারা সবসময় ঢেকে রাখতেন। যেন কেউ তাকে না চেনে। কিন্তু মানুষেরা কী করে যেন খবর পেয়ে গেলো। তার ভাই তাকে বোঝাতে এলো এবং তার ফকীরসূলভ জীবনপদ্ধতির ওপর তিরস্কার করে অনেক কিছু বলে ফেললো। বাদশাহ সবকিছু কানভরে শুনলেন। তিনি ভাইয়ের কানে একটি কথা বললেন। সেই কথা তার কানে পড়তে না পড়তেই সেও প্রেমের শিকার হয়ে গেলো। সেও বাদশাহী ছেড়ে ভাইয়ের পথ বেছে নিলো এবং তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করলো। এখানেই মাওলানা রুমী (রহ) বলেন,

"প্রেম শুধু যে সাক্ষাতে লাভ হয়, তা নয়;
বরং সেটা লাভ হতে পারে কথনেও।"

প্রেমের সম্পদ শুধু দেখার কারণে অর্জিত হয় না। কখনো প্রিয়ের সাথে সাক্ষাতকারীদের মুখ থেকে তার আলোচনা শুনেও প্রেমের আগুন জ্বলে ওঠে অন্তরে। তাই প্রিয়ের দীদারে ধন্য যারা, তাদের কাছে বসো। তাদের মুখ থেকে তার আলোচনা শুনো। প্রেমিকদের সান্নিধ্যে বসো। দেখবে, তোমার অন্তরেও জ্বলে ওঠেছে প্রেমের আগুন। কারণ কবির ভাষায়,

جو آگ کی خاصیت ہے وہ عشق کی خاصیت
اک خانہ بخانہ ہے اک سینہ بہ سینہ ہے

"আগুনের যা বৈশিষ্ট্য, প্রেমেরও তাই
আগুন যায় ঘর থেকে ঘরে, প্রেম যায় অন্তর থেকে অন্তরে।"

তোমরা তাদেরই সান্নিধ্য গ্রহণ করো, যাদের অন্তরে হরদম জ্বলে প্রেমের আগুন।
কুরআনে ইরশাদ করা হয়েছে,

ٱلرَّحْمَـٰنُ فَسْـَٔلْ بِهِۦ خَبِيرًا ﴿٥٩﴾

"তিনি দয়ালু। তার সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞ (নবী বা তার অনুসারীদের কাছে) জিজ্ঞাসা করো।"[৩৩]

তার খবর কোন অভিজ্ঞ থেকে জিজ্ঞাসা করো। যে এতই সাবধান যে, মাহবুব ব্যতীত তার কাছে আর কারো খবরই নেই। তোমরা তাদের কাছেই বসো, যাদের যাতায়াত শুধু মাহবুবের কাছেই। তোমাদের অন্তরেও ঝলকে ওঠবে প্রেমের আগুন।

আমরা কতইনা কৃতঘ্ন!

অনেক সময় আমরা ভালো করে বুঝতে চাই না যে, যেসব জিনিস আমরা পাই এবং যেসব নেয়ামতে আমরা ধন্য হই, সেটা আল্লাহর বড় করুণা। আমরা অজ্ঞতাবশত আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই না। আবার সেই নেয়ামত যখন হাতছাড়া হয়, তখন তার মূল্য ও মর্যাদা বুঝে আসে। সেই সাথে আফসোস জেগে ওঠে অন্তরে।

আজ আমরা পরিস্কার-সাস্থ্যসম্মত পানি যে কোন জায়গায় পর্যাপ্তভাবে ও সহজভাবে পাই। তাই পানির মূল্য ও গুরুত্ব আমাদের ভেতর তেমন একটা নেই। তবে যারা পাহাড়ী অঞ্চলে বসবাস করে এবং যাদের সামান্য পানির জন্য যেতে হয় মাইলের পর মাইল, দূরে অতি দূরে, তারাই মর্মে মর্মে বুঝে পানির মূল্য ও গুরুত্ব। অথবা যারা বাস করে শুকনো মরুভূমিতে। সামান্য নোংরা ও ময়লাযুক্ত পানির জন্য যাদেরকে যেতে হয় দূর থেকে দূরান্তরে, তারাই পানির মূল্য অনুভব করে হাড়ে-হাড়ে। শরীর যখন সুস্থ থাকে, তখন তার মূল্য তেমন বুঝে আসে না। কিন্তু রোগ-ব্যাধিতে সাস্থ্য যখন নুয়ে পড়ে, ডাক্তাররা যখন দুরারোগ্য বলে ছাড়পত্র দেয়, তখনই বুঝে আসে সুস্থতা ও স্বাস্থ্য কত বড় নেয়ামত। রাত জেগে ইবাদত-বন্দেগি করতে

[৩৩]. সূরা আল-ফুরকান : ৫৯

পারা আল্লাহর বড়ই নেয়ামত। এই তাওফীক যার হয়েছে, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা তার জন্য অবশ্যই জরুরী। আরো জরুরী নেয়ামতের বাস্তবসম্মত মূল্যায়ন।

অন্তর-ব্যাধির চিকিৎসার দ্বিতীয় মূলনীতি আল্লাহর যিকির

আল্লাহ তা'আলার সাথে আমাদের বন্দেগি ও গোলামি সম্পর্ক নামে ও বাহ্যরূপে তো রয়েছে, তবে কাজে ও বাস্তবে তা অনুপস্থিত। সেই ভেঙ্গে পড়া সম্পর্ক নবায়ন করার কুরআনী নীতি হলো প্রথমত সৎ লোকদের সুহবত এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে বেশি করে আল্লাহ তা'আলার যিকিরে মশগুল থাকা।

বাস্তব সত্য হলো জীবনের আনন্দ-আহ্লাদ, মজা ও স্বাদ সবকিছু আল্লাহ তা'আলার যিকিরের ভেতরে লুকায়িত। হাদীসে এসেছে, কোথাও যখন আল্লাহর যিকিরের বৈঠক চলে, হাজার হাজার ফেরেশতা তার আশে-পাশে ঘুরেন এবং সেখানে তারা বসে যান। হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত,

إِنَّ لله مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللهَ تَنَادَوْا... وفي رواية عنه فَإِنَّ لله مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يَتَتَبَّعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَئُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا.

"আল্লাহর কিছু ফেরেশতা রয়েছে, যারা রাস্তায় ঘুরা-ফেরা করেন, যিকিরকারী তালাশ করেন। কোন জনগোষ্ঠিকে যখন আল্লাহর যিকিরে পান, তখন তারা অন্যান্য ফেরেশতাদেরকে ডাকেন। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহর কিছু ফেরেশতা রয়েছেন যারা জমিনে আল্লাহর যিকিরকারী তালাশ করে বেড়ান। কোথাও যখন আল্লাহর যিকিরের বৈঠক পেয়ে যান, তারাও সেখানে বসে যান। তারা পরস্পর পাখা দিয়ে বৈঠককে এমনভাবে ঘিরে নেন, যেন আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত শুধু ফেরেশতাই ফেরেশতা"[৩৪]

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহ) ফুয়ূযুল হেরমাইন কিতাবে লেখেন, "আমি মক্কায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মস্থানে উপস্থিত হয়েছি। দিনটি নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

[৩৪]. সহীহ বুখারী, কিতাবুদ্ দাওয়াত, হাদীস নং ৬০৪৫। সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, হাদীস নং ২৫। জামে' তিরমীযী, কিতাবুদ দাওয়াত, হাদীস নং ৩৬০০।

জন্মদিন। বহু লোক জমায়েত হয়েছিলো। তারা নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ করছিলো। নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নুবুয়ত প্রকাশের পূর্বে যেসব মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছিলো, সেগুলোর আলোচনা চলছিলো সেখানে। আমি দেখলাম, হঠাৎ পুরো সমাবেশ আলোকিত হয়ে গেলো। আমি ঠিক বলতে পারবো না, এই আলো কি আমি চামড়ার চোখে দেখেছি, না কি দেখেছি অন্তরচক্ষু দিয়ে। আল্লাহই ভালো জানেন, চামড়ার চোখ ও অন্তরচক্ষুর মাঝখানে কোন ইন্দ্রিয় আছে কিনা, যা দিয়ে আমি সেই আলো দেখতে পেয়েছি। আমি যখন সেই আলোর দিকে আরো গভীরভাবে লক্ষ্য করলাম, তখন তাতে সেইসব ফেরেশতাদের ফয়য দেখতে পেলাম যারা এই ধরনের বৈঠক পর্যবেক্ষণ করার দায়িত্বে নিয়োজিত। মোটা কথা, আমার মনে হলো ফেরেশতাদের আলো ও রহমতের আলো মিলে যেন একাকার।

বাস্তব কথা হলো যিকিরের বৈঠকে আলো নেমে আসে উর্ধ্বলোক থেকে। তবে বস্তুবাদিতার বিপদে বিপন্ন মানুষের বিবেক দ্বিধা করে যে, মজলিসে মানুষের ভাগ্যে কিছু জুটলো কি না। মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি ভিন্ন ও বিভিন্ন হওয়ার কারণে কোন প্রভাব গ্রহণ করতে অনেকের দীর্ঘ সময় লেগে যায়। আবার অনেকের অল্প সময়ে হয়ে যায়। এই পার্থক্যের ফলাফল সময়ে সময়ে প্রকাশ পায়। এই পার্থক্যের কারণে কেউ যেন একথা না বুঝে যে, আহলুল্লাহর সুহবতে কিংবা আল্লাহর যিকিরে কোন লাভ বা প্রভাব নেই। আমি দৃঢ় নিশ্চয়তা নিয়ে বলতে পারবো, কোন ব্যক্তি, তার অন্তরে গুনাহের মরিচিকা, মানসিক নৈরাজ্যের কালিমা, আত্মার আঁধারি ও সম্পদ-লোভের কেলেঙ্কারির মতো জঘন্য দোষ থাকলেও, যিকিরের ও আহলুল্লাহর মজলিসে ধারাবাহিকভাবে বসলে, অবশ্যই পরিবর্তিত হবে তার দিন-রাত, পাল্টে যাবে হৃদয়ের গতিপথ।

উপস্থিতি ও আনন্দের গভীর অনুভূতি

কোন কোন বন্ধু অভিযোগ করে যে, যিকিরের মজলিসে অংশগ্রহণের পরও স্বাদ থেকে তারা বঞ্চিত, আনন্দের গভীর অনুভূতি তাদের জাগে না। তাদেরকে বলবো, যিকিরের কারণে অবশ্যই স্বাদ অর্জিত হয়। তবে একথাও মনে রাখতে হবে যে, স্বাদের অনুভূতি জাগাই যিকিরের আসল উদ্দেশ্য নয়। যিকিরের আসল উদ্দেশ্য হলো মাহবুবকে (আল্লাহকে) স্মরণ করা। কেউ কেউ মনে করে, যিকির তো করলাম। কোথায়, আমি তো স্বাদ পেলাম না। হয়তো

আমার যিকির কবুল হয় নি। এই ধরনের ধারণা নিতান্তই ভুল ও ভ্রান্ত। মাওলানা রুমী (রহ) তো বলেন, বান্দা যখন এক বার আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে, তখন দ্বিতীয় বার তার মুখ থেকে তার নাম উচ্চারিত হয় না, যতক্ষণ না প্রথম বারের উচ্চারণ আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায়। কোন বান্দা বার বার 'আল্লাহ-আল্লাহ' উচ্চারণ করতে পারাটা তার পক্ষ থেকে তাওফীক প্রাপ্তির প্রমাণ। দ্বিতীয় বার আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারা প্রথম বারেরটা কবুল হওয়ার পরেই হয়ে থাকে। বান্দার মুখে আল্লাহর যিকির জারি হয়ে যাওয়া একথার প্রমাণ যে, আল্লাহর কাছে তার যিকির খুবই পছন্দ। ইরশাদ হয়েছে,

فَاذْكُرُونِيٓ أَذْكُرْكُمْ ﴿١٥٢﴾

"তোমরা আমাকে স্মরণ করো। আমি তো তোমাদের স্মরণ করবো।"[৩৫]

যখন বান্দা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে, তখন আল্লাহ তার উত্তরে অন্ততঃ একাবার হলেও তার স্মরণ না করা অসম্ভব। কারণ আল্লাহই তো বান্দাদেরকে জীবন-নীতির নির্দেশনা দিয়ে ইহসানের বদলে ইহসান করার আদেশ দিয়েছেন। তা হলে তিনি স্বয়ং কত প্রতিদান দিতে পারেন,

هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَٰنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَٰنُ ﴿٦٠﴾

"সৎকাজের প্রতিদান উত্তম, পুরস্কার ব্যতীত কি হতে পারে?"[৩৬]

আল্লাহ তা'আলা নিজেই বান্দাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন,

مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾

"যে একটি সৎকর্ম করবে, সে তার দশগুণ পাবে এবং যে, একটি মন্দ কাজ করবে, সে তার সমান শাস্তিই পাবে। বস্তুতঃ তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।"[৩৭]

'তার মতো' শব্দ একথার দিকে ইঙ্গিত করে যে, বান্দা একটি ভালো কাজ করলে তাকে সেই ভালো কাজের ন্যায় দশটি ভালো কাজ দেওয়া হবে।

---

৩৫. সূরা বাকারা : ১৫২
৩৬. সূরা আররহমান : ৬০
৩৭. সূরা আনআম : ১৬০

এখানে এক একটি ভালো কাজের দশটি প্রতিদানের কথা বলা হয় নি। বরং বলা হয়েছে, বান্দা যা করবে, তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সেটা দশ বার দেওয়া হবে। 'তার মতো' শব্দটি মাথায় রেখে এবার আমরা সূরা বাকারার উল্লিখিত আয়াতটি দেখতে পারি যেখানে তিনি বলেছেন, 'বান্দা তুমি আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাকে স্মরণ করবো।' বুঝা গেলো বান্দা যখন আল্লাহকে একবার স্মরণ করে, তখন আল্লাহ তাকে দশ বার স্মরণ করেন। একান্ত নির্জনতায় বান্দা যখন বলে, 'আল্লাহ' তখন আল্লাহ দশবার বলেন, 'বান্দা আমি উপস্থিত'।

বান্দা যখন একশ'বার আল্লাহ বলে, তখন আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে এক হাজার বার স্মরণ করেন। এই তথ্যের দিকে নিম্নোক্ত হাদীসটি ইঙ্গিত করছে,

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِى، فَإِنْ ذَكَرَنِى فِى نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِى نَفْسِى ، وَإِنْ ذَكَرَنِى فِى مَلإٍ ذَكَرْتُهُ فِى مَلإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ.

"হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি বান্দার সাথে সেভাবে ব্যবহার করি, যেভাবে সে আমাকে মনে করে। সে যখন একান্তভাবে আমার যিকির করে, আমিও একান্তভাবে তার কথা স্মরণ করি। আর সে যখন প্রকাশ্যভাবে (মজলিসে) আমাকে স্মরণ করে, আমিও তাকে প্রকাশ্যে (নবী, ফেরেশতা, শহীদগণ ও নৈকট্যভাজনদের কাছে) তার স্মরণ করি।"

তেমনিভাবে আরেকটি হাদীসে কুদসী রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنْ أَتَانِى يَمْشِى أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.

"বান্দা যদি আমার দিকে হেটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।"[৩৮]

আল্লাহর দয়া ও ক্ষমার অবস্থা এই যে,

إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সমূহ গুনাহ ক্ষমা করে দেন। তিনি নিশ্চয় ক্ষমাবান ও দয়ালু।"[৩৯]

[৩৮]. বুখারী শরীফ, খ.২, পৃ.১১০১

তিনি স্বীয় যিকিরে প্রফুল্ল মুখাবয়বকে কিছুইে বঞ্চিত করবেন না। এই ধরনের ধারণা পোষণ করা আল্লাহ তা'আলার প্রতি অযৌক্তিক ভ্রান্ত ধারণার শামিল। এই ধরনের ধারণা যারা পোষণ করে, তারা যেন আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতিকে অস্বীকার করলো, অশ্রদ্ধা জানালো, অসত্য মনে করলো।

এটা অবশ্যই সত্য যে, মানুষের অন্তরে বিচিত্র কল্পনা, বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনা ও মানসিক অস্থিরতা লেগে থাকে। কখনো তার অন্তরে এমন কল্পনা হয় যে, আমরা মুখ তো অপবিত্র। মিথ্যা, পরনিন্দা, অত্যাচার ও পাপাচারের কালিমায় কলুষিত আমার অন্তর। এমন অপবিত্র মুখ দিয়ে যিকির করলে কোন লাভ হবে কি? আমরা বলতে চাই, মুখ অপবিত্র হোক না তাতে কী যায়-আসে। অপবিত্র জিনিসকে পবিত্র করারও তো পদ্ধতি আছে। কোন কাপড় অপবিত্র হলে তাকে পানি দিয়ে আমরা পবিত্র করে নেই। পানি বহু অপবিত্র জিনিসকে ধোয়ে পবিত্র করে দেয়। আল্লাহ তা'আলার যিকির, সে তো স্বচ্ছ ও পরিছন্ন এক নদী-প্রবাহ। যার দ্বারা আত্মার সমূহ ময়লা ও কালিমা নিমিষেই পরিস্কার হয়ে যায়। মুখ যেখানে শরীরেরই একটি অঙ্গ, সেখানে যিকিরের আধিক্য দ্বারা সেটা কেন পবিত্র হবে না? কারণ অধিক যিকিরের ফলে অন্তরে আলো সৃষ্টি হয়। হৃদয়ে সূচিত হয় শান্তি ও সুস্থিতি। মুখ যখন সেই যিকিরের মাধ্যম হলো, তাহলে সেটা কেন যিকির দ্বারা পবিত্র হবে না? বেশি করে আল্লাহ তা'আলার যিকির করলে অন্তরে তার প্রতি ধীরে ধীরে লজ্জা সৃষ্টি হবে। মানুষ যখন অন্য কাউকে ভালোবাসে, তখন তাকে অনেক কিছুতে লজ্জাও পায়। ত হলে আল্লাহ তা'আলার যিকির করতে থাকলে, আল্লাহ তা'আলার প্রতি লজ্জা কেন সৃষ্টি হবে না?

আল্লাহওয়ালাদের পরিচয়

প্রিয়কে যারা ভালো করে বুঝতে পারে, তারা তার যথাযথ পরিচয় পায় এবং তার সৌন্দর্য পর্যবেক্ষণ করতে পারে। তখন তাদের অবস্থা এই হয়ে দাঁড়ায় যে,

إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا۟ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী ক্ষমাময়।"[৪০]

[৩৯]. সূরা জুমার : ৫৩
[৪০]. সূরা ফাতির : ২৮

তাদের অন্তর আল্লাহ তা'আলার ভয়-ভক্তিতে গলে গলে মোম হয়ে যায়। এটাই হলো আল্লাহকে ভয় করার সর্বশীর্ষ স্থান। ইরশাদ হয়েছে,

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾

"পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত।"[৪১]

তিনি আরো বলেছেন,

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ ﴿٤٦﴾

"যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে পেশ হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্যে রয়েছে দু'টি উদ্যান। (একটি পুরস্কারের, একটি রহমতের)।"[৪২]

যে ব্যক্তি আল্লাহকে লজ্জা করে অপকর্ম থেকে বিরত থাকে, পাপাচারের দিকে ধাবমান যার পা জবাবদেহিতার অনুভূতির কারণে গুটিয়ে যায়, কুপ্রবৃত্তির দম্ভে উদ্ধত অন্তরকে আল্লাহর ভয়ে যে অশ্রুসিক্ত করতে পারে, সর্বোপরি যার বেপরোয়া নজর প্রিয়ের লজ্জায় আনত হয়ে পড়ে, তাকে আল্লাহ তা'আলা দু'টি জান্নাত দান করেন।

একটি ঈমানোদ্দীপ্ত ঘটনা

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা সাইয়িদুনা হযরত ওমর ফারুকের (রা.) শাসন-আমলে এক যুবককে একজন মহিলা অপকর্মের দিকে আহ্বান করলো। সে আল্লাহর ভয়ে চিৎকার করে উঠলো। যার ফলে শরীর ও আত্মার বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেলো অর্থাৎ সে মারা গেলো। তাকে দাফন করার পর হযরত ওমর ফারুক (রা.) তার কবরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, অপকর্ম থেকে বিরত থাকিয়ের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে দু'টি জান্নাতের ওয়াদা রয়েছে। তুমি কি তা পেয়ে গেছ? কবর থেকে আওয়াজ আসলো। হ্যাঁ, হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা সত্য ছিলো। আমি তা পেয়ে গেলাম।

[৪১]. সূরা নাযিয়াত : ৪০-৪১
[৪২]. সূরা আর-রহমান- ৪০-৪১

বান্দা যখন আল্লাহকে লজ্জা পায়, তখন সে মিথ্যা ও অপকর্ম থেকে বিরত থাকে। মুখ যত পবিত্র হতে চলবে, তনু-মন ততই পরিছন্ন হতে থাকবে। মানুষের বিবেক তাকে সতর্ক করে হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আল্লাহকে লজ্জ করো।

যিকিরের গূঢ়ানুভূতি/বিশেষানুভূতি থেকে বঞ্চনা ও তার স্বরূপ-সন্ধান

আল্লাহর যিকিরের মজলিসে কোন কোন ব্যক্তির বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হয় না। যিকিরের মাধ্যমে এক অনন্য স্বাদ পাওয়া যায়। এক পর্যায়ে তার বন্ধ আখিঁ আলো দেখতে শুরু করে। কখনো কিছুক্ষণের জন্য তাদের চোখের সামনে আলোর দরিয়া ঢেউ তুলে যায়। কখনো আল্লাহর যিকিরের আলো বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন রঙে উদিত হয়। সবুজ, নীল, লাল, সাদা বিবিত্র রঙের হয়ে দেখা দেয়। এই আলো ছড়িয়ে পড়ে উপর, নিচ, সামনে, পেছন চতুর্দিক থেকে। কখনো এই আলো বিকিরিত হয় তাদের বক্ষ থেকে। স্বভাব-প্রকৃতির ভিন্নতার কারণে কোন কোন ব্যক্তি সপ্তাহের ভেতরই এই আলো দেখতে পায়ে, কেউ বা মাসে, কেউবা পুরো বছরে। আবার কেউবা একবারও দেখতে পায় না পুরো জীবনে। ভালোবাসার এই বিশেষ ভ্রমণে স্বাদ ও আলো প্রত্যক্ষ করতে না পারার কারণে অনেকে ভয় পেয়ে যায় যে, যিকির করা সত্ত্বেও কেন আমি বিশেষ অবস্থা থেকে বঞ্চিত। বাস্তবে যিকিরের কারণে অবশ্যই বিশেষ অবস্থা ও প্রভাবের সৃষ্টি হয়। কারণ এটা কি সম্ভব, আল্লাহর যিকির অধিক পরিমাণে করা গেলো অথচ কোন প্রভাব সৃষ্টি হলো না? তবে এখানে মনে রাখা দরকার, মানুষ দু'ধরনের হয়ে থাকে। এক. যাদেরকে যিকিরের প্রভাব ও অবস্থা দ্বারা তাৎক্ষণিকভাবে তৃপ্ত করা হয়। দুই. যাদেরকে আল্লাহর কোন হিকমাতের (ঐশী রহস্য) কারণে সেই অবস্থা থেকে পৃথিবীতে বঞ্চিত রাখা হয়। (তবে সেই যিকিরের আখেরাতীয় ফল অবশ্যই সে পেয়ে যাবে)

বিশেষাবস্থা ও পর্যবেক্ষণ তরীকত-পথের আলোকিত বাঁক ও মোড়

কিছু ব্যক্তি আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে শক্ত স্নায়ুর অধিকারী হয়ে থাকে। তাদের পাত্র ও ধারণক্ষমতা মজবুত হয়ে থাকে। যিকিরের কারণে যখন তাদের কাছে আলোর প্রবাহ শুরু হয় এবং বিশেষাবস্থা সৃষ্টি হয়, তখন তারা

মনে করে, এগুলো যিকিরের ছায়া-চিহ্ন। তারা সেই অবস্থার দিকে লক্ষ রাখে না এবং তাতে তারা হারিয়ে যায় না। কারণ মানুষ যদি অবস্থায় হারিয়ে যায়, তখন সে পথ ভুলে যায়। সে অবস্থাকে পূর্ণতা মনে করে না। অবস্থা থেকে সেও কিছু অনুভূতি অবশ্যই গ্রহণ করে। তবে তার পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে প্রিয়ের স্মরণের দিকে। ফলে সে রাস্তা থেকে সরে যায় না। বিশেষ অবস্থা হলো যিকিরের বাঁক। পথিকের লক্ষ্য তো মনজিল, পথের মোড়ে আটকে থাকা নয়। অবস্থা হলো প্রেম-পথের সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক দৃশ্য। গাড়ি যখন চলে, তখন তার ডান-বামের বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত ও দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যলীলা অন্তরকে টানে। তেমনিভাবে মানুষ যখন আল্লাহর ভালোবাসায় মগ্ন হয়ে যিকির করে, তখন ভালোবাসার সেই ভ্রমণ-পথে আলোর কিরণ দেখা দেয়। অনন্য অবস্থার আনন্দোন্মাদনা খেলে যায় তার অন্তরে। খুলে যায় রহস্যের রাজতোরণ। সূফীগণের অভ্যাস-নীতি হলো তারা 'তাওয়াজ্জুহ' তথা গভীর ধ্যানসংযোগের মাধ্যমে যিকিরের প্রভাব মুরীদের অন্তরে সঞ্চার করেন। ফলে তার পঞ্চ-সূক্ষ্ম-শক্তি (যথা : কলবের সূক্ষ্মশক্তি, আত্মার সূক্ষ্মশক্তি, রহস্যের সূক্ষ্মশক্তি, গোপন সূক্ষ্মশক্তি এবং গোপনতম সূক্ষ্মশক্তি) ধীরে ধীরে খুলে যায়। সেই রূহানী দৃশ্যাবলি থেকে আলো মেলে, কিরণ মিলে। বহু লোক রয়েছে যারা সেই অনুভবে ও দৃশ্যে হারিয়ে যায়। কেউ কেউ রহস্যে ও রোমাঞ্চে হারিয়ে যায়। তারা না পূর্ণতার ঠাঁই পায়, না প্রকৃত স্বাদ পায়। তারা মনে করে, আমি তো আল্লাহ তা'আলার সত্তাগত ও গুণগত নূরের কিরণ পেয়ে গেছি, আমি তো সাক্ষাৎ পেয়েছি আল্লাহর, আল্লাহর নূর আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠলো, অর্জিত হলো কাশফ-ক্ষমতা। প্রকৃতপক্ষে এসব লোক রাস্তার বাঁকে আটকে আছে। তারা মনে করছে, পেয়ে গেছে মনজিল অথচ তারা এখনো পথহারাদের শামিল। সঠিক পথের দিশা হারিয়ে ঘুরতে থাকে কানাগলিতে।

এই ঔজ্জ্বল্য-মহিমা কতই না দীপ্তিকর!

এই ধরনের শক্ত রূহানী স্নায়ুর অধিকারী লোক খুব কমই থাকে। যাদের চোখে সবকিছু ভেসে ওঠার পরও মাঝপথে হারিয়ে না গিয়ে সঠিক মনজিলের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাবে। শতে নিরান্নব্বই ভাগ মানুষ অধিক যিকিরের কারণে সৃষ্ট গূঢ়াবস্থার ভেতর হারিয়ে যায়। তাদের এই ধারণা হয়ে বসে যে, আমরা তো অলী হয়ে গেলাম। আমাদের হাতে ও পাতে এসে গেছে বেলায়তের সমূহ কলকব্জা। এই ধরনের ধারণা নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা।

কোন ব্যক্তির সম্পর্ক যখন শাইখ, মুরুব্বি বা কোন ওস্তাদের সঙ্গে গ্রথিত হয়, শাইখ বা মুরুব্বি যদি বুঝেন যে, সালেকের (তরীকত-পথের পথিক) ভেতর এতটুকু সাহস নেই যে, তাকে বিশেষাবস্থাসৃষ্টি ও প্রত্যক্ষদর্শনের পরীক্ষা করা যাবে, তখন তিনি গাড়ি চালানোর সময় জানালায় পর্দা ঝুলিয়ে দেন। গাড়ি এখনো চলছে। বিচিত্র দৃশ্য অতিক্রম করছে। বিভিন্ন অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু কোন কিছু অনুভূত না হওয়ার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। যিকিরকারী ডানে-বামে কোন দৃশ্য না দেখে এবং কোন দৃশ্যের টানে হারিয়ে না গিয়ে নিরাপদে চলে যাচ্ছে দৃপ্ত পদে। দৃপ্ত পদে সফরের সবটুকু পর্যায় শেষ করার পর যখন মনজিলে পৌঁছে যায়, তখন এদিকে সে মনজিলে পা দিচ্ছে, অপর দিকে তার শাইখ ঝুলিয়ে রাখা সব পর্দা সরিয়ে নিচ্ছেন। ফলে তার চোখের পর্দায় ঝলমলিয়ে ভেসে ওঠে সৌন্দর্যের সেই উৎস-চাঁদ যার সামনে রাস্তার মনকাড়া দৃশ্যরাও হার মানে নিমিষে। পৃথিবীর সৌন্দর্যরা যার ওপর ঈর্ষা করে। সেই উৎস থেকে উৎসারিত হয় সমূহ সৌন্দর্য। এসবকিছু দেখে সে বুঝতে পারে সেই অবস্থাবলি ও দৃশ্যাবলি নিশ্চয় সুন্দর ছিলো। কিন্তু এই মহিমা তার চেয়ে শতগুণ মনোরম ও মহীয়ান। অবস্থাবলি পরীক্ষায় ফেলে। আল্লাহর যিকিরকারী কোন দৃশ্য চায় না, তারা চায় শুধু আল্লাহকে। অবস্থা যদি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মিলে যায় তো ভালো। রহস্যের রাজত্ব যদি ভাগ্যে জুটে যায় ঠিক আছে। তবে তাদের দৃষ্টি সর্বদা নিবদ্ধ থাকবে আল্লাহর দিকে।

এক চমৎকার চিত্রায়ন

পৃথিবীতে যখন আমরা কোনে কারখানা নির্মাণ করি, তখন আমদের মূল উদ্দেশ্য হয় কোন বিশেষ ধরনের পণ্যদ্রব্য (Products)। সেই উৎপন্নদ্রব্যের সাথে কিছু অতিরিক্ত দ্রব্যও (By Products) পাওয়া যায় এবং সেগুলো বিক্রি করেও অর্থ উপার্জন করা যায়। কিন্তু কারখানার মূল উদ্দেশ্য হলো প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য অর্জন করা। তেমনিভাবে অন্তরে কারখানার আসল উদ্দেশ্য হলো যিকিরের সঙ্গে সখ্য গড়তে গড়তে মাযকূর (তথা আল্লাহর) সাথেও সখ্যতা গড়ে তোলা। আলো ও অবস্থার ভূমিকা হলো 'অতিরিক্ত পণ্যদ্রব্যের' যা মৌলিকভাবে উদ্দিষ্ট নয়।

মাওলানা রুমী (রহ) বর্ণিত একটি ঘটনা

মাওলানা রুমী (রহ) বলেন, এক সময় মজনু দরিয়ার কিনারায় বসে শুধু শুধু লায়লার নাম লিখছিলো। এক বার লেখে আবার মুছে দেয়। একজন

তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো। তাকে জিজ্ঞাসা করলো, ভাই তুমি কী করছো ? সে বললো,
রুমীর কবিতায়,

"লায়লার নাম লেখে লেখে মশক করছি
এবং নিজের হৃদয়কে সান্তণা দিচ্ছি।"

অর্থাৎ আমার উদ্দেশ্য তো শুধু অন্তরকে সান্তণা দেওয়া। যিকিরকারীদের উদ্দেশ্যও মাহবুবের স্মরণের মাধ্যমে হৃদয়কে শান্তি ও সান্ত্বণা দেওয়া। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

"জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তর সমূহ শান্তি পায়।"[৪৩]

তাদের জীবনের লক্ষ্য অন্য কিছু নয়, শুধু মাহবুবের নাম নেওয়াই। যিকির করতে করতে এমন এক মুহূর্ত আসে যখন অন্য সবকিছু থেকে অন্তর বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধু তার জন্যই হয়ে যায়। তখন অন্তর তার স্মরণের অনুশীলনে উন্মাদ হয়ে যায়।

وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿٨﴾

"আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাতে মগ্ন হোন।[৪৪]

অতঃপর তাদের মুখ ও অন্তর মাহবুবের অনুশীলনের স্তর পার হয়ে আরো দূর এগিয়ে যায়।

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَٰرُ ﴿٣٧﴾

"এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামায কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে।"[৪৫]

৪৩. সূরা রা'আদ : ২৮
৪৪. সূরা মুজ্জাম্মিল : ৮
৪৫. সূরা নূর : ৩৭

তাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ তা'আলার যিকিরে সাথে সম্পর্কিত। আর তারা আল্লাহর আদেশকে নিত্য নূতন মিলনের মোহনা বুঝে যিকিরে মশগুল থাকে। ইরশাদ হচ্ছে,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾

" মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর।"[৪৬]

তারা অশ্রুসিক্ত নয়নে এমনভাবে যিকির করে যে, মাহবুবের আগ্রহ আরো বেড়ে যায় বহু বেগে। তাদের অবস্থার যেন প্রতিনিধিত্ব করে কবির এই পঙক্তি,

اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکیں
وہ آ جائیں تو جم کے برس، اور اتنا برس کہ وہ جا نہ سکیں

"হে করুণার মেঘমালা তুমি একটু থেমে থেমে বর্ষণ করো
এতটুকু বর্ষণ করো না, যাতে সে আসতে না পারে।
সে যখন এসে যাবে, তখন জোরে-শোরে বর্ষণ করো
যেন আর সে যেতে না পারে।"

যখন মানুষ অধিক পরিমাণে যিকির করে, তখন সে যিকির তার মুখ থেকে অতিক্রম করে তার অন্তরগভীরে ও রক্তে-রন্ধ্রে মিশে যায়। এভাবে তার ভাগ্যে জুটে যায় সেই অবস্থা, যার দরুণ আল্লাহর দীদার নসীব হয়। নজর শুধু নিবদ্ধ থাকে তার পানে- প্রেমের পথে। কবির ভাষায়,

"উদ্দাম প্রেম তোমাকে নিয়ে যায় অলিতে-গলিতে
নিজের তালাশে নিজে সে নাচে,
তোমাকে নিয়ে চলে নিজের পথে।"

আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া আমাদের সম্পর্ককে যদি পুনরায় জোড়া দিতে চাই, তাহলে মনে রাখতে হবে যে, আহলুল্লাহর সুহবতে বসলে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ আসে। আহলুল্লাহর মনোযোগের কারণে তার যিকির আল্লাহ তা'আলার সম্পর্ককে পুনস্থাপনের মাধ্যম হয়ে যায়। সম্পর্কের কেটে যাওয়া রশ্মি ফের জোড়া লেগে যায়। অতঃপর প্রিয়ের ছোট্ট গলির ঠাণ্ডা বাতাসও তার প্রাণের জন্য সুশীতল পানীতে পরিণত হয়। তার স্মরণ

৪৬. সূরা আহযাব : ৪১

তরতাজা হাওয়া হয়ে হৃদয়ের ফুটন্ত মুকুলকে নাড়া দেয়। এই যিকির চোখের পর্দা ওঠিয়ে দেয়। প্রিয়ের গুণগত সৌন্দর্যের মহিমা দৃষ্টিগোচর হতে শুরু করে। ফলে একদিকে যিকির চলে অন্যদিকে প্রিয়ের সাক্ষাতের সম্পদ শোভে। এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াতটি খুবই তাৎপর্যবহ।

ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِى وَكَانُوا۟ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾

"যাদের চক্ষুসমূহের উপর পর্দা ছিল আমার স্মরণ থেকে এবং যারা শুনতেও সক্ষম ছিল না।"[৪৭]

এই আয়াতের বিপরীতার্থক ভাবার্থ হলো কেউ কেউ এমন হয়, যিকির করতে গিয়ে যাদের চক্ষু থেকে পর্দা ওঠে যায়। আর চক্ষু থেকে যখন পর্দা ওঠে যায়, তখন আসল সৌন্দর্য (আল্লাহ তা'আলার সৌন্দর্য) দৃষ্টিগোচর হয়। এ অবস্থায় যিকিরকারী নিজেকে পর্যন্ত ভুলে যায়। এ অবস্থাকে কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে,

وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴿٢٤﴾

"যখন ভুলে যান, তখন আপনার পালনকর্তাকে স্মরণ করুন।"[৪৮]

বান্দাকে বলা হয়েছে যে, আল্লাহকে ব্যতীত অন্য সবকিছু ভুলে যাও। সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার সঙ্গে জুড়ে যাও। কবির ভাষায়,

"প্রেম করতে হলে করো, তবে জীবিত-চিরজীবিতের সঙ্গে
মৃতের সঙ্গে প্রেম করলে কেন টিকবে।"

প্রেম করো তার সঙ্গে যে নিজে জীবিত এবং অন্যকে জীবিত করে, যে নিজে প্রতিষ্ঠিত এবং অন্যকেও প্রতিষ্ঠিত করে। যে ব্যক্তি তার ভেতর বিলীন হয়ে যায়, তাকে তিনি স্থায়ী করে দেন। যদি তুমি তাকে ছেড়ে দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীর সঙ্গে প্রেম করো, তাহলে তোমার সর্বনাশ হবে। কারণ দুনিয়াবাসী মৃত। তাদের ভালোবাসাও মৃত। এই দুনিয়ার সমস্ত সৌন্দর্যও মৃত। তুমি শুধু তাকে (আল্লাহকে) ভালোবাসো। এমনভাবে ভালোবাসো যাতে সবকিছু থেকে তোমার অনুরাগ কমে যায়।

[৪৭]. সূরা আল-কাহাফ- ১০১
[৪৮]. সূরা আল-কাহাফ- ২৪

یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ پیوند- بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ

"পৃথিবীর এই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সম্পদ
সবকিছুই কল্পনার ভূত,
আল্লাহ ছাড়া নেই কোন মা'বুদ।"

মানুষের অন্তর পিয়ানোর (বাদ্যযন্ত্র) সঙ্গীতের মতো। যার অনেকগুলো তন্তু (তার) থাকে। কোন তন্তু সুর তোলে যিকিরের কারণে। কোনটি দরূদ ও সালামের কারণে। কোনটি না'আত শুনে। কোনটি অধিক নফলের মাধ্যমে। তন্তু যেটাই চলুক, আমাদের উদ্দেশ্য রুহে সঙ্গীত সৃষ্টি করা। প্রত্যেক তন্তুর আওয়াজ ভিন্ন হয়ে থাকে। তাকে যখন ধারাবাহিকভাবে বাজানো শুরু করে দেবো, তখন সেটা সঙ্গীত ও সুর হয়ে যায়। যখন সঙ্গীত হয়ে যায়, তখন সেখান থেকে সৃষ্টি হয় অন্তরদরদ। অধিক যিকিরের ফলে সবকটি তন্তু একই সাথে বেড়ে ওঠে। সেখান থেকে সৃষ্টি হয় শব্দ। অতঃপর সৃষ্টি সুর-তরঙ্গ। আমাদের উদ্দেশ্য হলো সেই সুর-তরঙ্গের মাধ্যমে হৃদয়ে ভালোবাসা সঙ্গীত সৃষ্টি করা। কবি বলেন,

گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر
ہوش و خرد شکار کر قلب و نظر شکار کر

"আলোকিত চূর্ণকুন্তলকে আরো করো চমৎকার
বিবেক-বুদ্ধি শিকার করো, হৃদয়কেও করো শিকার।"

মুসলমান ভাইয়েরা! উদ্দেশ্য যদি অর্জন করতে হয়, তাহলে তন্তু ও আওয়াজের সংঘাতে পড়ো না। সুর ও সঙ্গীতের কথা বলো। আলহামদুলিল্লা! মিনহাজুল কুরআন আওয়াজ ও তন্তুর বিতর্ক থেকে উর্ধ্বে ওঠে সমূহ তন্তু একত্র করে সঙ্গীত সৃষ্টি করতে চায়। যার যে তন্তু কিংবা তার হোক সব তার বেজে ওঠবে। অন্তর ব্যথিত হবে। আঁখি অশ্রুসিক্ত হবে, স্বাদ ভাগ্যে জুটবে। আর এই সম্মিলিত সঙ্গীত পরিবেশনের ফলে অন্তর-রাজ্যে সূচিত হবে এক দুর্দান্ত বিপ্লব।

হে মুমিন বান্দা! যদি আল্লাহ তা'আলার সাথে পুনরায় সম্পর্ক দৃঢ় করতে চাও, তাহলে অধিক পরিমাণে যিকির করো। আহলুল্লাহর সুহবতে বসো। যিকিরের মাধ্যমে প্রতিদিন বাজিয়ে তোলো হৃদয়-যন্ত্রের তারগুলো। আল্লাহর ভালোবাসায় ডুবে যাও। তা হলেই ছিঁড়ে যাওয়া সুতো আবার জুড়ে যাবে।

চতুর্থ অধ্যায়

অন্তরব্যাধির দ্বিতীয় প্রকার : হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে গোলামির সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়া, এবং তার কারণসমূহ

বর্তমান যুগে অন্তরব্যাধির চিকিৎসাপত্র পেশ করার ক্ষেত্রে এই বাস্তবতাকেও সামনে রাখতে হবে যে, অন্তরব্যাধির এই দুঃখবহ ঘটনা দু'টি কারণে ঘটেছে।

১। আল্লাহ তা'আলার সাথে আমাদের বন্দেগির সম্পর্ক নামে বিদ্যমান। কাজে ও বাস্তবে অবিদ্যমান।

২। রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে গোলামি ও ভালোবাসার সম্পর্ক অন্তর থেকে ছিন্ন হয়ে যাওয়া।

অন্তরব্যাধির প্রথম কারণের তাৎপর্য স্পষ্ট করার পর আমাদের এখন দরকার, দ্বিতীয় কারণের তাৎপর্য পর্যালোচনা করা। সেই সাথে এও পর্যালোচনা করা যে, উম্মতের ওপর এই কারণটির মন্দ প্রভাব কতটুকু পড়েছে? যাতে ব্যাধির কঠিনতা ও ভয়াবহতা অন্ততঃ ক্ষয়-ক্ষতির অনুভূতি সৃষ্টি করে এবং উম্মত চিকিৎসার চিন্তা-ফিকির নিয়ে সেই দিকে জলদি অগ্রসর হয়।

আজ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অন্তরের ফেতনার দ্বিতীয় কারণটি হলো- রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমদের গোলামির সম্পর্ক নামে ও শিরোনামে মাত্র। কাজে, বাস্তবে ও আত্মার দিক দিয়ে এই সম্পর্ক ছিঁড়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এই সম্পর্ক প্রকৃত, বাস্তবিক ও আন্তরিক হওয়ার পরিবর্তে বাচনিক, প্রামাণিক ও তাত্ত্বিক হয়ে গেছে, যা আবেগ-উদ্দীপনা থেকে মুক্ত। এটা শুধু বুদ্ধিবৃত্তিক ও যৌক্তিক প্রমাণ দিয়ে সাব্যস্ত করা হচ্ছে। এটা এখন শুধু কথায় উপস্থিত, কাজে নয়। অথচ অন্তরব্যাধির চিকিৎসাই হলো আল্লাহ তা'আলার প্রিয় রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভালোবাসার প্রভাবে এই সম্পর্ক যেন আমাদের স্বভাবে ও অভ্যাসে পরিণত হয়। আমাদের ভাগ্যে যেন জুটে যায় সেই ঈমানোদ্দীপ্ত, আবেগপূর্ণ, আত্মিক ও গোপনতাত্ত্বিক অবস্থা, যার কারণে আমাদের অন্তরাত্মা আনন্দিত হবে, হবে আলোকিত। এখানে মনে রাখতে হবে, আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার দু'টি কারণ পাওয়া গেলো : বস্তুবাদ ও প্রবৃত্তি।

বুঝা গেলো, রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে আমাদের গোলামির সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কারণও দু'টি।

রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে আমাদের গোলামির সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কারণ

১। দুনিয়াদারির আড়ালে ঘটমান ফেতনা

২। দ্বীনদারির আড়ালে ঘটমান ফেতনা

এই ফেতনাদ্বয়ের বিস্তারিত বর্ণনার পূর্বে আমাদেরকে স্পষ্ট করতে হবে, রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গোলামির সম্পর্কের স্বরূপ কী? প্রকৃতপক্ষে গোলাম তাকেই বলে যে অন্যের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। সে নিজেকে অন্যের কাছে এমনভাবে সঁপে দিয়েছে যাতে সে নিজের ব্যক্তিত্ব, অবস্থা, লেনদেন, শোয়া, উঠা-বসা, চলাফেরাসহ কোন কিছুতে নিজের ইচ্ছাকে ব্যবহার করবে না। কারণ গোলামির তাৎপর্য হলো- গোলামের প্রত্যেক জিনিস মালিকেরই হয়ে যাওয়া। তার জান, আত্মীয়-স্বজন, চিন্তা-ভাবনা, হাসি-কান্না, মরা-বাঁচা, সুখ-দুখ, ইজ্জত-সম্মান সবকিছু মালিকের হয়ে যাবে। রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে আমাদের গোলামির সম্পর্ক তখনই প্রমাণিত হবে, যখন রাসূলের সাথে আমাদের সম্পর্ক ও ভালোবাসা এমনভাবে মজবুত হবে যে, দেখতেই যেন বুঝা যায়, এ তো বিক্রি হয়ে গেছে। বিক্রি হয়ে যাওয়া যখন নসীব হবে, তখন পথের ধূলিকণারও ভাগ্য হবে 'সীনা ওয়াদীর' উঁচুতার অর্জনের। কবির ভাষায়,

جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا
تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا

"বিক্রি হওয়ার আগে তো কেই নামও নিতো না আমার ।
তুমিই তো কিনে আমাকে যেন করেছো মূল্যের আধার ।"

যারা বিক্রি হয়ে যায়, আল্লাহর যিকির ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রেমে তাদের এমন উন্মত্ত অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, তার ওপর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রেমিকরাও ঈর্ষা করে। তারা আল্লাহ ও রাসূলের এমন পাগল হয়ে যায় যে, দুনিয়া হুশ থেকে বে-হুশ হয়ে যায় এবং প্রিয়ের হুশ ছাড়া আর কোন কিছুর খবর তাদের থাকে না। কারণ

"এই হুশের রহস্যজ্ঞান বে-হুশ হওয়া ছাড়া সম্ভব নয়"

মাহবুবের সাথে তাদের এমন ভালোবাসা ও প্রেমোন্মাদনা সৃষ্টি হয় যে, মাহবুবের পক্ষ থেকে তাদের কাছে বার্তা আসে।

"যাদের খবর হয়েছে (আল্লাহ-প্রেমের)
পুনরায় আসলো না তাদের কোন খবর ।"

তাদের কাছে মাহবুবের স্মরণ এমন ইবাদতে পরিণত হয় যার ধারাবাহিকতা তাদের জন্য প্রাণের পরম প্রশান্তি হয়।

খাজা হযরত ওয়াইস করনীর (রহ) জীবন ও জীবনী থেকে প্রেম ও ভালোবাসার সেই অবস্থার কিছু ধারণা নেওয়া যায়। তিনি আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রেমে এমনভাবে পাগল ও অস্তিত্বহীন হয়ে গিয়েছিলেন যে, মানুষেরা তাকে পাগল বলতো। শিশুরা তাকে পাথর মারতো এবং তাকে নিয়ে হাসাহাসি করতো। একদিন তিনি বাজার থেকে আসছিলেন, শিশুরা তার দিকে পাথর ছোঁড়া শুরু করলো। বড় বড় পাথর মারলে রক্ত বেশি বের হতো এবং অজু ভেঙে যেতো। তিনি শিশুদেরকে কাছে ডাকলেন এবং খুব স্নেহসিক্ত স্বরে বললেন,

"শিশুরা আমি তোমাদের পাথর মারার ওপর কোন অভিযোগ করছি না। তবে আমি আরজ করবো, তোমরা ছোট ছোট পাথর মারো। বড় পাথর মারো না।

শিশুরা মনে করলো, তিনি তো ভয় পেয়ে গেলেন। তারা বলতে লাগলো, এটা তো প্রেমের দাবিই না ছিলো শুধু। বড় পাথর সহ্য করার তো তার সাহস নেই। তখন তিনি বললেন, আমি কথাটি আসলে ভয়ে বলি নি। বলছি এজন্যই, বড় পাথর মারলে রক্ত বের হয় বেশি পরিমাণে এবং এতে অজু ভেঙ্গে যায়। আমি চাই, আল্লাহর স্মরণে ধারাবাহিকতা রক্ষা করি। আমিও যেন সর্বদা অজুবান থাকি এবং মাহবুবের স্মরণসূত্রও যেন টিকে থাকে। এই ধরনেরই ছিলো আল্লাহপ্রেমিকদের অবস্থা। যাদের কাছে মাহবুবের স্মরণ থেকে ক্ষণিকের জন্যও বিচ্ছিন্ন হওয়াটা শরীর থেকে প্রাণ চলে যাওয়ার নামান্তর। তাদের দর্শন হলো এই ,

"যতক্ষণ গাফেল থাকি, ততক্ষণ কাফের থাকি ।"

এখানে চিন্তার বিষয় হলো, আজ আল্লাহ তা'আলা এবং তার প্রিয় রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে আমাদের সম্পর্কে খালি ঝুলি ও সম্পর্কের কারণে প্রাপ্তিমান অবস্থার সাথে কি কোন যোগসূত্র আছে? যদি না থাকে (আমাদের বিশ্বাস নেই) তাহলে আমাদের মন-মস্তিষ্কের নৈরাজ্যের কারণ খুঁজে বের করতে হবে। রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে গোলামির সম্পর্ক ছিঁড়ে যাওয়ার ভিত্তি যে দুই ফেতনার ওপর প্রতিষ্ঠিত, এখন সেগুলোর প্রভাব-প্রতিপত্তি অনুভব করা ঈমানের একান্ত দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রথম ফেতনা : বুদ্ধি-পূজা/বুদ্ধিবাদী মনোভাব

বর্তমান যুগের মানুষ প্রযুক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তা ও সৃষ্টিশীলতার সময় অতিক্রম করছে। বস্তুবাদী সভ্যতা-সংস্কৃতি, মানসিক ঝোঁক-প্রবণতা, আধুনিক

চিন্তাধারা ও মতবাদ, ঐশী বাণী ও নববী শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থাই আজ মানুষের চিন্তাধারা, অজ্ঞতা, অনুভূতি ও মানসপ্রবণতা নির্মাণ করছে এবং সেগুলোকে লালন-পালন করে চলেছে। বস্তুবাদী প্রবণতা ও নাস্তিক্যবাদী চিন্তাধারার প্রতাপে তাপিত হয়ে আজকের মানুষ চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে নিজেকে পরিপূর্ণ ও পরিপক্ব ভাবছে। মানুষ যখন পার্থিব বিষয়ে ও বাণিজ্যিক কাজ-কর্মে নিজের সফলতার পথ নিজেই বের করতে সক্ষম হয়েছে, আধুনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক দিয়ে তার বিবেক-বুদ্ধি উন্নতি করেছে, উপরন্তু সে যখন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়নের পর্যালোচনা করেছে; তখন সে বুঝে নিয়েছে যে, মানুষি বিবেক-বুদ্ধি সব যুগে উন্নয়নশীল ছিলো, এখনো আছে। সে যখন ইতিহাসের প্রাচীন যুগগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করেছে, তখন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার দিক দিয়ে সেগুলোকে আঁধারির গেরাটোপে বদ্ধ পেয়েছে। সে বুঝেই নিয়েছে, মানবজাতির ইতিহাসে যত উপরের দিকে যাওয়া হয়, ততই আঁধারির সূত্র দীর্ঘ হতে চলে। আর ইতিহাসের শিরায় হাতে রেখে দেখি, তখন মনে হয় যে, সময়ের চাকা যতই সামনের দিকে এগিয়েছে, ততই মানুষি বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-শক্তি ধারাবাহিকভাবে উন্নতি করেছে। অজ্ঞতা ধীরে ধীরে দূর হয়েছে। জ্ঞান-বুদ্ধির আলো ছড়িয়ে পড়েছে। সে আরো মনে করেছে, এখন যুগের মানুষেরা অন্ধকার যুগ থেকে বের হয়ে আলোকিত যুগে পদার্পন করেছে এবং আঁধারি থেকে আলোর দিকে উত্তরণের এই ধারাবাহিক সফর সে নিজের বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে অতিক্রম করেছে।

মানুষি চিন্তার ভয়ঙ্কর ভ্রান্তি

উপরোক্ত চিন্তাধারার কারণে ধীরে ধীরে আরেকটি ভ্রান্ত চিন্তার বাজারজাত হচ্ছে। সেটা হলো, বর্তমান যুগে ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনকে সফল ও সুন্দর করার জন্য নববী শিক্ষা বা দিকনির্দেশার কোন প্রয়োজন মানুষের নেই। বরং আজকের এই উন্নত যুগে হাজার বছর আগের কথা বলা এবং দ্রুতগামী উড়োজাহাজের বদলে পায়ে হেটে সফর করার ফযীলত বর্ণনা করা, বলতে গেলে, অনেকটা কৌতুকময় ও হাস্যকর বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। একারণেই মুসলমানদের এক দল এই ধরনের চিন্তাধার গ্রহণ করেছে। ফলে তাদের সামনে কুরআন-হাদীস ও নববী শিক্ষার আলোচনা করা হলে তারা বলে, "নতুন যুগে পুরাতন যুগের কথা বলে বা শুনে লাভ কী?

আজ এই বুদ্ধিবাদী মনোভাবের ফেতনা কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে জোরে-শোরে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং এটাকে এক বিশেষ ষড়যন্ত্র হিসেবে

মুসলিম জাতির যুবকদের মনে-মস্তিষ্কে দৃঢ় করা হচ্ছে। এই ফেতনা দিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে আঘাত হানা হচ্ছে সেই শ্রেণীকে যারা ধন-সম্পদ নিয়ে ব্যস্ত ও মত্ত। যারা উড়োজাহাজ দিয়ে পুরো পৃথিবীতে আধুনিক যুগের প্রযৌক্তিক উন্নতির অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করেছে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এমন হয়ে গেছে যে, আজকের মানুষ নিজের বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-শক্তি দিয়ে আকাশের তারকাদের অতিক্রম করছে। তাদের জন্য প্রাচীন ও প্রথাজীর্ণ শিক্ষানীতি ও দিকনির্দেশনার কি প্রয়োজন? আধুনিক বস্তুবাদী সভ্যতার গভীর প্রভাবে পথভ্রষ্টতা ও শয়তানি যখন মানুষের মনে-মস্তিষ্কে শেকড় গেড়ে বসেছে এবং মানুষ যখন মনে করে নিয়েছে যে, আমি কোন নববী শিক্ষা-দীক্ষার মুখাপেক্ষী ও দ্বারস্থ নই। তখন নবীগণের আলোকোজ্জ্বল শিক্ষানীতি সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক যে, তারা নিজেদের যুগের ভ্রষ্টতাকে সংশোধন করার জন্য জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু আজকে যেহেতু জ্ঞান-বুদ্ধির প্রশস্ততার কোন সীমা নেই। সেই সাথে আমাদের যুগ সেই যুগের তুলনায় জ্ঞান-বুদ্ধিতে বহু দূর অগ্রসর হয়েছে, তাই তাদের সেই জ্ঞান ও বুদ্ধিবিন্দু আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিসিন্ধুর তুলনায় শ্রুতি আর স্মৃতি মাত্র। এই ধরনের মানসিকতা যখন সৃষ্টি হলো, ঈমান ও আকীদার ভিত নড়ে গেলো। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও দ্বীনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তার অন্তর থেকে হারিয়ে গেলো। এই ধারণা সৃষ্টি হওয়ার যৌক্তিক ও মানসিক ফলাফল এই দাঁড়ালো যে, যে ব্যক্তি নিজেকে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হেদায়ত ও নুবুওয়তপ্রদত্ত আলোর মুখাপেক্ষী মনে করলো না, সে যেন অবচেতনভাবে নুবুওয়তের পদে শরীক হয়ে গেলো। সে যখন মনে করলো, সেই বিবেকবান লোকেরা যা করতেন, আমিও তা করছি, তখন তার অন্তর থেকে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শ্রদ্ধা মুছে গেলো। ফলে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)সাথে তার গোলামির সম্পর্ক সমূলেই ছিঁড়ে গেলো।

এই হলো মুসলিম জাতির দুঃখবহ ঘটনা। আজ অসংখ্য শিক্ষিতদের অন্তরে বুদ্ধিপূজার বিষ সংক্রমিত হয়েছে। আমরা ইউনিভার্সিটি পর্যায়ে এমন শিক্ষকদের দেখেছি যারা মুসলমানদের দেশে বসবাস করে বলেই আল্লাহ ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কথা বলতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে ব্যক্তিগত বৈঠকে ও আলোচনায় তারা ধর্মকে অপ্রয়োজনীয় মনে করছেন। রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বতোভাবে অনুসরণীয় আদর্শ মেনে নেওয়াকে বেকুবসূলভ ধারণা মনে করছেন। এমতাবস্থায় তাদের সামনে ইসলামকে কিয়ামত পর্যন্ত সফলতার একমাত্র গ্যারান্টি হিসেবে আখ্যায়িত

করলে তারা সেটাকে হাসিতে উড়িয়ে দিয়ে বলে, অন্ধকার যুগের কিছু প্রভাব দেখি এখনো বিঁধে আছে কিছু বিবেকে। অবস্থা দেখলে মনে হয় যেন, বর্তমানে ধর্ম অন্ধকার যুগের কিছু স্মৃতি মাত্র। দ্রুত বেগে জ্ঞান-বুদ্ধি ও আধুনিক সভ্যতার আলো যতই ছড়িয়ে পড়বে, ততই ধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তি দুর্বল ও দুর্লভ হয়ে যাবে। বহু লোক এমন দেখা গেছে যারা নির্বোধসূলভ নিজের মানসি অস্থিরতা ও চিন্তানৈতিক জড়তার কথা উচ্চকণ্ঠে বলে থাকে। আবার কেউ কেউ আছে যাদের মন-মস্তিষ্ক এসব ধ্যান-ধারণা ও কল্পনা দিয়ে কলুষিত। তবে তারা প্রকাশ্যভাবে বলার সাহস রাখে না। সারকথা হলো এই, উম্মতের এক বিশেষ শিক্ষিত শ্রেণীর ভেতরে যখন তথাকথিত বুদ্ধিপূজা সৃষ্টি হয়েছে, তো রাসূলের সাথে তাদের গোলামির সম্পর্ক নিশ্চিতভাবেই কেটে গেছে। এমনভাবে কেটে গেছে যেন,

کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا

"কাফেলার অন্তর থেকে যেন আশঙ্কার অনুভূতি পর্যন্ত মুছে গেলো।"

দ্বিতীয় ফেতনা :

মনগড়া রেসালত ভাবনার ওপর গেড়ে থাকা

প্রথম ফেতনার তাৎপর্য ও প্রভাব স্পষ্টভাবে বুঝে আসে। তবে দ্বিতীয় ফেতনার তাৎপর্য ও স্বরূপ বুঝা একটু কঠিন হবে। সেই ফেতনা হলো দ্বীনের পোশাকে দৃষ্টিগোচর হওয়া একটি ফেতনা। সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গভীর আলোচনা ও গবেষণার বিষয়ও। কারণ সেটা এমন এক মিষ্ট বিষ যা ধর্ম ও দ্বীনদারির নামে মানুষের ঈমানের রগে-রক্তে সংক্রমিত হয়। বড় বড় জ্ঞানী ব্যক্তিরাও দীর্ঘ দিন পর্যন্ত সেই বিষাক্ত প্রক্রিয়ার কথা বুঝে ওঠতে পারেন না। কারণ দ্বীনের সমস্ত নিদর্শন, ইবাদত ও অভ্যাস যেমন, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, যিকির, তাবলীগ, তাওয়াক্কুল, বান্দেগীসহ অন্যান্য সব আহকাম বহাল তবিয়তে বিদ্যমান থাকে। হুবহু সেই শিরোনামেই ফেতনাগুলি শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হতে থাকে সামনের দিকে।

ফেতনার স্বরূপ

কুরআন পাকে বিভিন্ন স্থানে হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পবিত্র আলোচনা বিচিত্র ভঙ্গিতে, নতুন নতুন আঙ্গিকে বিধৃত হয়েছে। তার একটি হলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানুষের মতো হওয়া।

ফেতনার সূচনা হলো এভাবে যে, রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্যান্য দিকগুলোর দিকে না গিয়ে শুধু 'মানুষের মতো হওয়া'র

ওপর বিতর্কের বাণ ছোঁড়া হচ্ছে। যার কারণে ধর্ম সম্পর্কে স্থূল ও সাধারণ জ্ঞানের অধিকারীদের মনে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের মতো একজন সাধারণ মানুষ হওয়ার ভ্রান্ত ধারণ বদ্ধমূল হতে চলেছে। ফলে অন্তর থেকে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার দাগ মুছে গেলো। ছিঁড়ে গেলো গোলামির বন্ধন।

তার স্বরূপ ছিলো আরো অন্য কিছু ...

আল্লাহ তা'আলা হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যক্তিত্বকে উঁচুতর মর্যাদার দিক দিয়ে দু'টি অবস্থান দান করেছেন। কুরআন মজীদ যার সরব প্রমাণ।

১। আবদিয়্যতের শান বা বান্দা হওয়ার অবস্থান

২। মাহবুবিয়্যতের শান বা আল্লাহর প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ হওয়ার অবস্থান।

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন নিজের পরিচয় নিজে দান করেন, তখন ঝলকে ওঠে তার আবদিয়্যাতের শান। যেমন,

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۝

" বলুন, আমিও তোমাদের মতই মানুষ।"[৪৯]

শুধু মানুষ হওয়ার মধ্যে আমি তোমাদের মতো। কাফের-মুশরিকদের দৃষ্টিও শুধু তাঁর মানুষি আকৃতি পর্যন্ত গিয়েছে। তাই তারা বলেছে,

قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۝

" তারা বলল, আপনারা তো আমাদের মতই মানুষ।"[৫০]

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানুষের মতো হওয়া সত্য ও বাস্তবসম্মত। এমনকি তিনি মানুষের মতো হওয়াটা তাঁকে নবী হিসেবে প্রেরণ করার চাহিদাও ছিলো। কারণ তাঁকে মানুষদের কাছে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করার জন্য পাঠানো হয়েছে। এই তাবলীগ শুধু বাচনিক ছিলো না, ছিলো বাস্তবিক। দৃষ্টিভঙ্গীয় ছিলো না, ছিলো প্রায়োগিক। শুধু পারলৌকিক ছিলো না, ছিলো ইহলৌকিকও। তাই আকৃতি-প্রকৃতিতে মানুষের মতো করা প্রেরণের প্রথম ও প্রধান চাহিদা ছিলো।

---

৪৯. সূরা হামীম সাজদা : ৬

৫০. সূরা ইয়াসীন : ১৫

হুজুরকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানবসূলভ বৈশিষ্ট্য, অভ্যাস, গুণ ও চাহিদা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, যা দেখে মানুষি চিন্তা স্খলিত হয়েছে। মানুষেরা দেখলো যে, তিনি তো আমাদের মতো খাদ্য খান, পান করেন, ঘুম পাড়েন, বিবাহ করেন, তাঁরাও ক্ষুধা লাগে, শরীরে ক্ষত হয়, রক্ত ঝরে। এসব দেখে তাদের ভ্রম হলো, তিনিও তো আমাদের মতো একজন।

দুঃখের বিষয় হলো, হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবদিয়্যতের শান তথা মানুষের মতো হওয়ার দিকটি সামনে উপস্থিত হলো এবং সেটার ওপর খুব জোর দেওয়া হলো। কিন্তু আল্লাহর মাহবুব হওয়া এবং শ্রেষ্ঠ নবী হওয়ার দিকটি নজর থেকে আড়ালে চলে গেলো এবং নুবুয়তী গুণ-জ্ঞান ও যোগ্যতা থেকে নজর সরিয়ে নেওয়া হলো। অথচ খোদ কুরআনই সেই দিকটির ওপর খুব জোর দিয়েছে,

تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴿٢٥٣﴾

" এই রসূলগণ-আমি তাদের কাউকে কারো উপর মর্যাদা দিয়েছি। "[৫১]

অর্থাৎ মর্যাদার দিক দিয়ে সমস্ত রাসূল সমান নন। বরং,

مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَٰتٍ ﴿٢٥٣﴾

"তাদের মধ্যে কেউ তো হলো যার সাথে আল্লাহ্ কথা বলেছেন, আর কারও মর্যাদা উচ্চতর করেছেন।"[৫২]

নবীদের মধ্যে আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বহু দিক দিয়ে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। অন্যান্য নবী-রাসূলগণের তুলনায় ব্যক্তিত্ব ও পদমর্যাদা দু'দিক দিয়েই তিনি অনন্যা সাধারণ।

হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যক্তিক মর্যাদা

কোন তুলনা বা পর্যালোচনা ছাড়াই একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাহবুবে হাকীকীর (আল্লাহর) নিকট সান্নিধ্যের যে মর্যাদা অর্জনে ধন্য হয়েছেন, তা আর কোন নবীর ভাগ্যে জুটে নি। ইকবাল এই বাস্তবতাকে খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন,

"সকল নবীর সর্দার যিনি, উম্মুল কিতাবের অধিকারী
উর্ধ্বলোকের সাথে সম্পর্ক তার পর্দাহীন, সরাসরি।

[৫১]. সূরা বাকারা : ২৫৩
[৫২]. সূরা বাকারা : ২৫৩

যদিও তিনি আড়াল ছাড়াই সরাসরি খোদাকে দেখেছেন,
তবু তিনি তারই কাছে জ্ঞান বাড়ানোর আকুতি জানিয়েছেন।"

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾ عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ﴿٥﴾ ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ﴿٦﴾ وَهُوَ بِٱلْأُفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿٧﴾ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ﴿٨﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴿٩﴾ فَأَوْحَىٰٓ إِلَىٰ عَبْدِهِۦ مَآ أَوْحَىٰ ﴿١٠﴾

"এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। কোরআন ওহী, যা প্রত্যাদেশ হয়। তাঁকে শিক্ষা দান করে এক শক্তিশালী সহজাত শক্তিসম্পন্ন, সে নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পেল। উর্ধ্ব দিগন্তে, অতঃপর নিকটবর্তী হলেন ও অগ্রবর্তী হলেন গেল। তখন দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল অথবা আরও কম। তখন আল্লাহ্ তাঁর বান্দার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করবার, তা প্রত্যাদেশ করলেন।"[৫৩]

হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এটাও একটা মর্যাদা যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিজের রহমত-গুণের প্রতিবিম্ব বানিয়েছেন। যেখানে যেখানে আল্লাহ তা'আলার খোদায়ীর গুণ পৌঁছে গিয়েছে, সেখানে সেখানে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দয়ার গুণ প্রতিবিম্বিত হয়েছে। যেভাবে পৃথিবীর অণু-পরমাণুতে আল্লাহ তা'আলার খোদায়ীর বারি বর্ষিত হচ্ছে, সেভাবে পৃথিবীর কণায় কণায় রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দয়ার প্রানোদ্দীপক ছায়া সম্প্রসারিত।

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠٧﴾

"আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি।"[৫৪]

হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরেক বৈশিষ্ট্য হলো, খোদ আল্লাহই তাঁর ওপর ফেরেশতাদের মাহফিলে দরূদ ও সালাম প্রেরণ করছেন। অতঃপর সমস্ত ঈমানদারকে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি দরূদ প্রেরণের আদেশ দিচ্ছেন :

[৫৩]. সূরা নজম: ৩-১০
[৫৪]. সূরা আনবিয়া : ১০৭

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

"আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর জন্যে রহমতের তরে দোয়া কর এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর।"[৫৫]

কুরআন মজীদের যেখানে যেখানেই আল্লাহ তা'আলা রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্বোধন করেছেন, সেখানে ভালোবাসায় উপচেপড়া কোন উপাধি দিয়ে সম্বোধন করেছেন। কোথাও তিনি বলেছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾

"হে বস্ত্রাবৃত, রাত্রিতে দন্ডায়মান হোন কিছু অংশ বাদ দিয়ে।"[৫৬]

আবার কোথাও বলেছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾ وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ ﴿٥﴾

"হে চাদরাবৃত, উঠুন, সতর্ক করুন, আপন পালনকর্তার মাহাত্ম ঘোষনা করুন, আপন পোশাক পবিত্র করুন এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন।"[৫৭]

আল্লাহর সাথে হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পূর্ণ নৈকট্যের কথা নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ ۚ ﴿١٧﴾

"আর আপনি মাটির মুষ্ঠি নিক্ষেপ করন নি, যখন তা নিক্ষেপ করেছিলে, বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ স্বয়ং।"[৫৮]

---

[৫৫]. সূরা আহ্যাব : ৫৬
[৫৬]. সূরা মুজ্জাম্মিল : ১-২
[৫৭]. সূরা মুদ্দাস্সির : ১-৫
[৫৮]. সূরা আনফাল : ১৭

সূরা ফাতায় আল্লাহ তা'আলা রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাতকে নিজের হাত ঘোষণা দিয়ে ভালোবাসার পূর্ণায়ন করেছেন,

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ ﴿١٠﴾

"যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে, তারা তো আল্লাহ্র কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে।" [৫৯]

রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পদমর্যাদাগত অবস্থান

আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য সমস্ত নবী-রাসূলকে বিশেষ জনগোষ্ঠি ও বিশেষ জনপদের জন্য প্রেরণ করেছেন। হযরত সালেহ (আ) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ ﴿٤٥﴾

"আমি সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের গোত্রীয় ভাই সালেহ্কে এই মর্মে প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহ্র এবাদত কর।"[৬০]

হযরত হুদ (আ) সম্পর্কে বলেছেন,

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ ﴿٦٥﴾

"আদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের গোত্রীয় ভাই হুদকে।"[৬১]

কিন্তু যখন আখেরী নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রসঙ্গ এসেছে, তখন তিনি তাঁর রিসালতকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন,

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

"আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।"[৬২]

---

[৫৯]. সূরা ফাতাহ : ১০
[৬০]. সূরা নামল : ৪৫
[৬১]. সূরা আ'দ : ৬৫

কুরআন মজীদ অন্য কোন নবীর দায়িত্ব এটা ঘোষণা করে নি যে, তিনি নিজের জীবনের ভেতরে দ্বীনকে একটি জীবন্ত নীতি হিসেবে প্রচলন করবেন। এই দায়িত্ব শুধু আখেরী নবীরই। সুতরাং হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রেসালতের বহিঃপ্রকাশ সত্য দ্বীনের গ্যারান্টি হয়ে গেলো।

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿٢٨﴾

"তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে অন্য সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। সত্য সত্যায়নকারীরূপে আল্লাহ যথেষ্ট।"[৬৩]

হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এসব মর্যাদার কথা সামনে রেখে চিন্তা করলে আমাদের সামনে ফলাফল বের হবে, নবীদের ইমামের অনন্য ও অসাধারণ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে অন্যান্য নবীদের ওপর। এই মর্যাদার কারণ হলো হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিরল মাহবুবিয়্যত। অর্থাৎ আল্লাহর পরম প্রিয় হওয়ার সুবাদে অর্জিত হয়েছে এসব মর্যাদা-মানিক্য। তারপরও যদি তিনি (রাসূল) أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ আমি তোমাদের একজন মানুষ" বলে দেন, তাহলে বুঝতে হবে-এটা তাঁর আবদিয়্যাতের শান বা আল্লাহর বান্দা হওয়ার সগর্ব স্বীকৃতি। অথচ মানুষ কেন, যেখানে অন্যান্য নবীদের সাথে পর্যন্ত তাঁর কোন তুলনা হতে পারে না। তিনি সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যের আধার হওয়ার সুবাদে এবং আল্লাহর পরম প্রিয় হওয়ার সুসংবাদে তাঁর তুলনা তিনিই।

এখানে একটি বাস্তব কথা বলে দিতে হয় যে, যারা শুধু তাঁর 'মানব' হওয়ার ওপর জোর দেয়, তারা নিম্নোক্ত কারণে স্খলিত হয়েছে এবং বাস্তব সত্যে পৌঁছার পথে অসফল রয়ে গেছে। তা হলো এই :

১। আল্লাহর ও তাঁর প্রিয় রাসূলের মাঝে ভালোবাসার স্বরূপ অনুধাবন করতে পারে নি।

[৬২]. সূরা সাবা : ২৮
[৬৩]. সূরা ফাতাহ : ২৮

২। কুরআনী শিক্ষার একটি দিককে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে, সামগ্রিকভাবে কুরআনী শিক্ষাকে সামনে রাখে নি। ফলে মূল বিষয়ের বিভাজন তাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেছে।

৩। তাদের ভাবনা রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মর্যাদা প্রসঙ্গে একতরফা ও অসম্পূর্ণ হওয়ার কারণে দুর্বল হয়ে গেলো। আর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মর্যাদা-ভাবনা দুর্বল হওয়ার কারণে দ্বীন-ভাবনাও দুর্বল হয়ে গেলো।

৪। নিজের অসম্পূর্ণ ধারণা, সেই ধারণার ওপর আবার গেড়ে থাকা এবং মুখ ও কলমের ঔদ্ধত্যের কারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রেসালতের সম্ভ্রম বিনষ্টকরণে লিপ্ত হয়েছে।

৫। রেসালতের সম্ভ্রম বিনষ্টকরণে লিপ্ত হওয়ার এই হীন কাজটি উম্মতের মাঝে এমন ফেতনার সৃষ্টি করেছে, যা উম্মতের মাঝে নিকৃষ্টতম ফেরকাবাজি ও সাম্প্রদায়িকতার ভূমিকা দাঁড় করিয়েছে।

কুরআন ও রেসালতের অবস্থান : মৌলিক আলোচনা

কুরআনে বহু আয়াত আছে যা দ্বারা খোদ নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যবানে তাঁর 'মানুষের মতো হওয়াটা' প্রকাশিত হয়েছে এবং এ বিষয়ের বিভিন্ন দিক স্পষ্ট হয়েছে। পক্ষান্তরে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শ্রেষ্ঠ নবী হওয়া ও আল্লাহর মাহবুব হওয়ার কথাও বহু আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাহবুবিয়্যাতের শান স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে কুরআনের আয়াতে-আয়াতে বাহ্যিকভাবে কিছুটা বৈপরিত্য আছে বলে মনে হয়। যেমন, এক জায়গায় খোদ হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যবানে বলে দেওয়া হচ্ছে,

قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُمْ ۖ ﴿٩﴾

"বলুন, আমি তো কোন নতুন রসূল নই। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে।"[৬৪]

অন্যত্র বলা হচ্ছে,

وَلَلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ﴿٤﴾

[৬৪]. সূরা আহ্কাফ : ৯

"আপনার জন্যে পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়।"[৬৫]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٧٩﴾

"আপনার পালনকর্তা আপনাকে মোকামে মাহমুদে পৌছাবেন।" [৬৬]

অন্যত্র অবতীর্ণ হয়েছে,

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰٓ ﴿٥﴾

"আপনার পালনকর্তা সত্বরই আপনাকে দান করবেন, অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হবেন।"[৬৭]

দেখতে যদিও এসব আয়াতে বৈপরীত্য আছে বলে মনে হচ্ছে; কিন্তু প্রকৃপক্ষে এগুলোতে কোন বৈপরীত্য নেই। মূলত আবদিয়্যতের শান ও মাহবুবিয়্যতের শানের কথা আলোচিত হয়েছে। তিনি তো আল্লাহর বান্দা। বান্দার পক্ষ থেকে বন্দেগির প্রকাশ এভাবে হওয়া চাই যে, বান্দা নিজেই সানন্দে ও সগর্বে বলে দিবে, আমি আল্লাহর বান্দা। তাই নবীজীও বলে দিয়েছেন, আমি অন্যান্যদের মতো একজন আল্লাহর বান্দা। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা যখন মাহবুবের শানে মাহবুবিয়্যত বর্ণনা করবেন, তখন তিনি আবদিয়্যতের স্তর থেকে ওপরে তুলে 'নিজের একান্ত বান্দা' হওয়ার সম্মান দান করবেন, কবির ভাষায় :

عبد دیگر عبدہ چیزے دیگر- ما سراپا انتظار او منتظر

'বান্দা ও 'তার বান্দা' দুটো দুই জিনিস, আমরা তো আপাদমস্তক তারই অপেক্ষায় অপেক্ষমান।'

কুরআন মজীদের এক জায়গায় খোদ নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যবানে বলে দেওয়া হচ্ছে,

وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَٱسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِىَ ٱلسُّوٓءُ ۚ

﴿١٨٨﴾

[৬৫]. সূরা ওয়াদদোহা : ৪
[৬৬]. সূরা ইসরা : ৭৯
[৬৭]. সূরা আদদোহা : ৫

"আর আমি যদি গায়বের কথা জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম, ফলে আমার কোন অমঙ্গল কখনও হতে পারত না।"[৬৮]

এক দিকে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে বলেন,

وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُمْ ۖ ﴿٩﴾

"আমি জানি না, আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে।"[৬৯]

অন্য দিকে আল্লাহ তা'আলা একটি মূলনীতি বর্ণনা করেন,

عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن

رَّسُولٍ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ رَصَدًا ﴿٢٧﴾

" তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। পরন্ত তিনি অদৃশ্য বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না, তাঁর মনোনীত রসূল ব্যতীত। তখন তিনি তার অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন।"[৭০]

তেমনিভাবে অন্য এক জায়গায় বলেছেন,

وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿٢٤﴾

"তিনি অদৃশ্য বিষয় বলতে কৃপনতা করেন না।"[৭১]

আল্লাহ তা'আলা যেন নিজের ভাষায় সেই বাস্তবতাকে প্রকাশ কে দিলেন যে, হে মাহবুব ! আপিন নির্বাচিত, সন্তোষভাজন, সুচয়নিত ও গায়বের ওপর অবগত। এ কারণেই তো,

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

"এবং আপনাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না। আপনার প্রতি আল্লাহর করুণা অসীম।"[৭২]

[৬৮]. সূরা আ'রাফ : ১৮৮
[৬৯]. (সূরা আহ্কাফ : ৯)
[৭০]. সূরা জিন : ২৬-২৭
[৭১]. সূরা আত্-তাকভীর : ২৪
[৭২]. সূরা নিসা : ১১৩

একদিকে হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ আবদিয়্যতের বর্ণনা হচ্ছে এভাবে যে, তিনি নিজেই অন্যান্য গুণ ও যোগ্যতাকে না করে শুধু বান্দা হওয়ার গুণকে গৌরভের বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করছেন। ফলে তাঁর পবিত্র যবান থেকে উচ্চারিত হচ্ছে,

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا.

"আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না !"[৭৩]

অথচ অন্য জায়গায় তাঁর উচ্চ মর্যাদার কথা আলোচনা করেছেন,

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا۟ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦٤﴾

"আর সেসব লোক যখন নিজেদের অনিষ্ট সাধন করেছিল, তখন যদি আপনার কাছে আসত অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রসূলও যদি তাদেরকে ক্ষমা করিয়ে দিতেন। অবশ্যই তারা আল্লাহ্‌কে ক্ষমাকারী, মেহেরবানরূপে পেত।"[৭৪]

যেন তিনি (আল্লাহ তা'আলা) বলতে চান, হে আমার মাহবুব ! যদি তাদের আখেরাত নষ্ট হতে শুরু করে, পরিণাম অশুভ হয়ে যায়, দোযখ যদি তাদের ভাগ্যলিপিও হয়ে যায়। তবু তাদের তাকদীর পাল্টে যেতে পারে, যদি তারা আপনার পায়ের তলে এসে উপস্থিত হয়।

একদিকে হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বন্দেগি ও ইসতিগফারের অবস্থা এই যে, তিনি পুরো রাত মাওলার দরবারে কান্নাকাটি করেন, তাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন, তার সামনে সেজদাবনত হয়ে থাকেন দীর্ঘক্ষণ। আবার অন্যদিকে তাঁর প্রতি আল্লাহর ভালোবাসার অবস্থা এই যে, আল্লাহ নিজেই শপথ নিচ্ছেন সেই জমির, যে জমি রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পায়ের তলা চুমু খেয়ে ধন্য হয়,

لَآ أُقْسِمُ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ﴿١﴾ وَأَنتَ حِلٌّۢ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ﴿٢﴾

[৭৩]. সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাহাজ্জুদ, হাদীস নং. ১৫৭৮। সহীহ মুসলিম, কিতাবু সিফাতিল মুমিনীন, হাদীস নং. ৭৯, ৮০, ৮১। সুনানুত তিরমীযী, আবওয়াবুস্ সালাত, হাদীস নং. ৪১২। সুনানুন্ সাসাঈ, কিতাবু কিয়ামিল লাইল।

[৭৪]. সূরা নিসা : ৬৪

"আমি এই (মক্কা) শহরের শপথ করে বলছি। কারণ, (হে হাবিব) আপনি সে শহরেই থাকেন।"[৭৫]

আপাতদ্বন্দ্বের সমন্বয় হয় কীভাবে?

উপরিউক্ত আপাতদ্বন্দ্বের পর দু'টি পথ অবশিষ্ট থাকে। প্রথম হলো- একদিকের আয়াতগুলো মেনে নেবো। অপরদিকের আয়াতগুলো অস্বীকার করবো। কিন্তু এটা তো কুরআনের ভাষায় জঘন্য অপরাধ,

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴿٨٥﴾

"তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিয়দাংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দাংশ অবিশ্বাস কর?"[৭৬]

দ্বিতীয় পথ হলো- দুই দিকের আয়াতগুলোর মাঝে সমন্বয় খুঁজবো। ন্যায়নিষ্ঠভাবে যদি সমস্ত আয়াতের ওপর চিন্তা করা যায়, তাহলে সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, বান্দা যখন আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থিত হয়, তখন বন্দেগির অবস্থানে থাকে। ফলে তার ভেতর সবকিছু থাকা সত্ত্বেও সে একথা বলেই বেশি গর্ববোধ করে যে, আমি তো একজন বান্দা, আমার তো কিছু নেই। যা কিছু, সব তো আল্লাহ তা'আলার দেওয়া। এটাই হলো বন্দেগির শান ও স্বীকৃতি। কুরআনের ভাষায় হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুখে একথা বলে দেওয়া যে,

১। আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ
২। আমি জানি না,আমার মাওলা আমার সঙ্গে কী ব্যবহার করবেন?
৩। আমি যদি গায়ব জানতাম, আমি নিজের জন্য বহু কিছু সঞ্চয় করতাম।

এসব কথা বলা তাঁর বন্দেগির সগর্ব স্বীকৃতির প্রমাণ। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন বন্দেগির শান নিয়ে কথা বলেন, তখন তিনি 'মানুষের মতোই' হয়ে বলেন। বান্দা হওয়ার স্তর হলো- বান্দা নিজেকে বান্দা হিসেবে কেমন ভাবে? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বন্দেগির স্তরে নিজের সমূহ গুণ-যোগ্যতাকে না করে দেন। নিজের প্রভুকে সন্তুষ্ট করার জন্য নির্জন রাতে অশ্রুর সাগর বয়ে দেন। এটা হলো রাসূল নিজেকে বান্দার স্তরে দেখার প্রমাণ। পক্ষান্তরে তিনি আল্লাহ তা'আলার মাহবুব হওয়ার স্তর

[৭৫]. সূরা বালাদ : ১-২
[৭৬]. সূরা বাকারাহ্ : ৮৫

হলো আল্লাহ নিজের রাসূলকে কীভাবে দেখেন এবং অন্যান্য বান্দাদের সামনে তাঁকে কীভাবে উপস্থাপন করেন? সেটাই। আর আল্লাহ তাঁকে দেখেন এভাবে,

لَآ أُقۡسِمُ بِهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ ۝١ وَأَنتَ حِلُّۢ بِهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ ۝٢

"আমি এই (মক্কা) শহরের শপথ করে বলছি। কারণ, (হে হাবিব) আপনি সে শহরেই থাকেন।"[৭৭]

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্জন রাতে আল্লাহ তা'আলার দরবারে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এমনকি তাঁর পা মোবারক ফুলে যেতো। সেজদায় যখন যেতেন শরীর অনুভূতিহীন হয়ে যেতো। এত দীর্ঘ সেজদা করতেন যে, হযরত আয়েশা (রা.) কখনো, তাঁর শরীর থেকে রূহ চলে গিয়েছেন মনে করে, ভয়ে ত্রস্ত হয়ে যেতেন। নিজের ফুলে যাওয়া পা দেখে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে আকুতি জানাতেন, হে আল্লাহ ! আমি আপনার ইবাদতের হক আদায় করতে পারি নি। কিন্তু আল্লাহ যখন নিজের মাহবুবকে সম্বোধন করেন, তখন বলার ভঙ্গিই অন্যরকম,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُزَّمِّلُ ۝١ قُمِ ٱلَّيۡلَ إِلَّا قَلِيلٗا ۝٢ نِّصۡفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصۡ مِنۡهُ قَلِيلًا ۝٣ أَوۡ زِدۡ عَلَيۡهِ وَرَتِّلِ ٱلۡقُرۡءَانَ تَرۡتِيلًا ۝٤

"হে বস্ত্রাবৃত, রাত্রিতে দন্ডায়মান হোন কিছু অংশ বাদ দিয়ে; অর্ধরাত্রি অথবা তদপেক্ষা কিছু কম অথবা তদপেক্ষা বেশী এবং কোরআন আবৃত্তি করুন সুবিন্যস্ত ভাবে ও স্পষ্টভাবে।"[৭৮]

কোথাও আবার এভাবেও বলেছেন,

طه ۝١ مَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡقُرۡءَانَ لِتَشۡقَىٰٓ ۝٢

"তোয়া-হা আপনাকে ক্লেশ দেবার জন্য আমি আপনার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করি নি।"[৭৯]

এই পর্যন্ত এ বাস্তবতা আমাদের সামনে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সমন্বয় সম্ভব, সঙ্গতও বটে। আর তা হলো হুজুরের (সাল্লাল্লাহু

[৭৭]. সূরা বালাদ : ১-২
[৭৮]. সূরা মুজ্জাম্মিল : ১-৪
[৭৯]. সূরা তোয়াহা : ১-২

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভেতরে বন্দেগির শান ও মাহবুবিয়্যাতের শান একই সাথে একই সময়ে বিদ্যমান। তাই কুরআনের বন্দেগির শান যেভাবে বিধৃত হয়েছে সেটই জরুরী। আর মাহবুবিয়্যাতের শান যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, সেটাও অপরিহার্য।

অমুখ্য বিষয়ে মেতে থাকার ফেতনা

আমাদের জন্য দুঃখের বিষয় হলো আমরা অমুখ্য বিষয়ে মেতে থাকার ফেতনায় ফেঁসে গেছি। যেসব আয়াতে রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'মানুষ' বলা হয়েছে, সেসব আয়াতের ওপর জোর দেওয়া শুরু করেছি। ফলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের মতো মানুষ হওয়ার ভাবনাটা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে চলেছে আমাদের অন্তরে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে একজন শ্রেষ্ঠ মহামানব সে দিক থেকে নজর ফিরিয়ে নিলে এবং তিনি আমাদের মতো একজন মানুষ সে কথা ভাবতে থাকলে, মন ও মনন পর্যায়ে তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা থাকার কথা নয়। পক্ষান্তরে আমাদের মতো মানুষ হওয়ার দিকটাও মেনে নিয়ে আমরা যদি নিজেদের নজর নিবেদিত করতে পারি মহা মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ওপর, তাঁর গুণ ও যোগ্যতার ধারণা যদি অন্তরে বদ্ধমূল করতে পারি সর্বোপরি মুসলিম জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে তাঁর কল্যাণের অপ্রতিশোধ্য ঋণের কথা অকাতরে স্বীকার করে নিতে পরি, তাহলেই ছিঁড়ে যাওয়া বন্ধন গ্রন্থিবদ্ধ হয় পুনরায় এবং অন্তররাজ্য মহিমান্বিত হবে গোলামির গরিমায়।

একজন দ্বীনদার ও ন্যায়পরায়ণ মুসলমান রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানুষ হওয়াকেও অস্বীকার করতে পারে না। শ্রেষ্ঠ নবী ও আল্লাহর মাহবুব হওয়াকেও অস্বীকার করতে পারে না। হুজুরের জীবদ্দশায় তাঁর মান-অবস্থানের এই দুই দিক সম্পর্কে সাহাবারাও জানতেন, কাফের-মুশরিকরাও। কাফের-মুশরিকরাও চাঁদ দু' টুকরো হওয়ার ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছেন। রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাতে পাথরের কলেমা পড়ার ঘটনা তাদের জানা ছিলো। হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিস্ময়কর কৃতিত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব তাদের সামনে ছিলো। তেমনিভাবে সাহাবা কেরাম রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানুষ হিসেবে দেখেছেন এবং হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানুষ হওয়ার প্রমাণপুষ্ট আয়াতসমূহ বারবার তেলাওয়াত করেছেন। সাহাবারা ভালো করে জানতেন, আমাদের মতো হুজুরকেও (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ক্ষিধা আক্রান্ত

করে, তাঁরও ঘুম আসে, ক্ষত হলে রক্ত ঝরে, তিনিও গৃহকাজসমূহ আমাদের মতোই পরিচালনা করেন। এসব সত্ত্বেও কাফের-মুশরিকদের নজর ছিলো তাঁর মানুষ হওয়ার প্রতি। সাহাবাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো মহামানব ও শ্রেষ্ঠ নবী হওয়ার প্রতি। ফলে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে তাদের প্রেম-ভালোবাসা ছিলো প্রগাঢ়। তাঁর গোলামি ছিলো যারপরনাই গৌরবের বিষয়।

যারা রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মর্যাদাকে খণ্ডিতকরণের শিকার হয়েছে, তারা বাশারিয়্যত ও মাহবুবিয়্যতে উভয়টাকে স্বীকার করেছে ঠিক; কিন্তু বাশারিয়্যতকে বুদ্ধিবৃত্তিক ও যৌক্তিকভাবে প্রধান্য দিতে শুরু করেছে এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গির ওপর গেড়ে থাকাকে দ্বীনে খেদমত মনে করছে। শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকারোক্তি তো দিয়েছে, তবে ভাসমান দৃষ্টি দিয়ে নিস্তেজ ভাষা দিয়ে পর্যালোচনা করেছে। আলোচনা হিসেবে স্বীকার তো করে নিয়েছে, তবে কলমের গতি ও বক্তৃতার শক্তি পুরোটাই ব্যয় করেছে তাঁর 'মানুষ হওয়াকে' (বাশারিয়্যত) প্রমাণিত করার জন্য। যার ফলে কোথাও কোথাও কিছু কিছু ব্যক্তির কলমে এমন ঔদ্ধত্য এসে গেছে যার শব্দ-ভাষ্য থেকে অপমানের দুর্গন্ধ বের হতে লাগলো। পক্ষান্তরে কিছু সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা আছেন, যারা 'মানুষ হওয়াকে' বিশ্বাস করেন। তা স্বীকারও করে নিয়েছেন। কিন্তু তারা প্রধান্য দিয়েছেন তাঁর (মাহবুবিয়্যত তথা) আল্লার মাহবুব ও শ্রেষ্ঠ নবী হওয়াকে। চাঁদ টুকরো হওয়ার ঘটনা, পাথর কলেমা পড়ার ঘটনা, হুজুর আল্লাহর পরমপ্রিয় হওয়া, আখেরাতে উম্মতের জন্য সুপারিশকারী হওয়া, সর্বোপরি তাঁর মু'জিজার বড়ত্ব- এসবকিছু তাদের মন-মস্তিষ্কে দৃঢ়ভাবে গেড়ে বসেছে। রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভালোবাসা তাদের হৃদয়-গভীরে জায়গা করে নিয়েছে। 'যে যাকে ভালোবাসে, তাকে বেশি স্মরণ করে'- এই প্রবাদের মর্ম বাস্তবায়ন করার জন্য তারা সবসময় জিহ্বাকে তাঁর স্মরণে সজীব ও সতেজ রাখে। যাতে করে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভালোবাসা তাদের অন্তরে গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়।

বাস্তবতা হলো, 'মানুষ হওয়ার' ওপর অতিশয় বাড়াবাড়ি করলে শুকিয়ে যায় ঈমান-উদ্যানের পরাগ। নিভে যায় প্রেম-ভালোবাসার চেরাগ। ছিঁড়ে যায় গোলামির সোনালি সুতো। ফলে অন্তরে সৃষ্টি হয় ফেতনা-ফাসাদের কালিমা। 'মানুষ হওয়ার' ওপর যারা জোর দেয়, তারা প্রকৃত প্রেমিকের সুধা-স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়, যে স্বাদ ঈমানকে তাজাতর ও পক্বতর করার ক্ষেত্রে

বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। শত স্বাগত জানাই তাদেরকে, যাদের অন্তর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রেমে পুরিত। রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে তাদের এমন অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি হয়েছে যে, যখন তাঁর আলোচনা চলে, তাদের হৃদয় উদ্বেলিত হয়। চক্ষু অশ্রুসজল হয়। অন্তরে খেলে যায় আনন্দের বিদ্যুৎবিভা। হুজুরের শানে নাত যখন পরিবেশিত হয় তাদের সামনে, তারা যেন হারিয়ে যায় অন্য ভুবনে। কবির ভাষায় :

"জান যখন ভিন্ন হলো, জাহান তো ভিন্ন হবেই।"

ঈমানের মধুরতা রাসূলের প্রেমের সাথে শর্তযুক্ত

রাসূলের মানুষ হওয়া প্রসঙ্গে এতটুকু বলে দেওয়া যথেষ্ট যে, কুরআন-হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানুষ হওয়ার প্রমাণ ভুরি ভুরি রয়েছে। এটা যারা অস্বীকার করবে, তারা কাফের। কিন্তু ঈমানের মধুরতা উপভোগ করতে হলে, তাঁর ভালোবাসা হৃদয়ে জাগাতে হলে, ঈমানের চেরাগ জ্বালিয়ে অন্তররাজ্যকে আলোকিত করতে হলে ঘন্টায় এক মিনিট বাশারিয়্যতের আলোচনা করতে হবে। আর বাকি উনষাট মিনিট আলোচনা করতে হবে শ্রেষ্ঠত্বের। যাতে করে রাসূলের শান-মান সম্পর্কে অনবগত ও গৌণ বিষয় নিয়ে মেতে থাকা মানুষদের ভেতরে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা বাসা বাঁধে। তাদের অন্তরও যেন ঈমানের মধুরতায় ভরপুর হয়। খোদ যিকিরকারীদের অন্তরেও যেন তাঁর ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। এটাই হলো ঈমান-পূর্ণতার শীর্ষ স্তর। যখন আলোচনা হবে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চাঁদোজ্জ্বল চেহারার, তাঁর চোখের, তাঁর হাসির কিংবা তাঁর নুরাণী শরীরের, তখন অবশ্যই তাঁকে দেখার বাসনা জাগবে অন্তরে। যেমন কবি বলেন,

"প্রেম তো জন্মায় না শুধু দেখার পরে
অনেক সময় জন্মাতে পারে আলোচনার কারণে।"

যখন এই বাসনা প্রার্থনা হয়ে উচ্চারিত হবে মুখে মুখে। হে আল্লাহ! যার ধ্যানে-স্মরণে সারা জীবন কাটাচ্ছি, তাঁকে একটু দেখার তাওফীক দান করুন! এই ধরনের দোয়াই রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে প্রেমোদীপ্ত ভালোবাসার স্ফুলিঙ্গ অন্তরে ঝলসে ওঠার প্রমাণ হবে। প্রেমের স্ফুলিঙ্গ যখন প্রজ্বলিত হলো, গোলামির সম্পর্কও পুনরায় স্থাপিত হলো। তবেই তো 'মানুষ হওয়ার' বিতর্কে বাড়াবাড়ির কারণে সৃজিত বিকারের আঘাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

মুবাল্লিগদের ভয়ঙ্কর স্খলন

আজকে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে আমাদের গোলামি সম্পর্ক জীর্ণ ও কর্তিত হয়ে যাওয়ার একটি বড় কারণ হলো মুবাল্লিগদের অপরিণামদর্শিতা। যার ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়ার কথা ইকবাল আলোচনা করেছেন এভাবে,

کسے خبر کہ سفینہ ڈبو چکی کتنے – فقیہ وصوفی وشاعر کی ناخوش اندیشی

" কে খবর রাখে ডুবলো কতটুকু তরী?
ফকীহ, সূফী ও কবিদেরই অপরিণামদর্শিতা বৈকি?"

কিছু কিছু মুবাল্লিগ পুরো শক্তি রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানুষ হওয়ার আকীদাকে প্রমাণিত করার পেছনে ব্যয় করছেন। ফলে তারা শুধু আমল ও আহকামের আলোচনাই করেন। শরীয়তের মাসআলা ও আদেশ-নিষেধের প্রতি বেশি জোর দেন এবং শিক্ষার আলোচনাও হচ্ছে পুরোদমে। এখানে এসেও আবার খণ্ডিতকরণ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেছে। কিতাবের আলোচনা করা হলো, কিন্তু কিতাবওয়ালার আলোচনা হলো না। শরীয়তের আলোচনা ওঠলো, কিন্তু শরীয়তওয়ালার কথা বিস্মৃতির তাকে তুলে রাখা হলো। আমলের ওপর ছওয়াব ও প্রতিদানের কথা ভালো করেই হলো, কিন্তু যেই সত্তার মায়াবী ঠোঁটের কারণে এ কল্যাণ ও ফয়যান, তাঁকে ঘূর্ণাক্ষরেও স্মরণ করা গেলো না। নামাজ-রোজা সহ অন্যান্য আহকামের কথা ভালো করে আলোচিত হলো, কিন্তু যেই রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কারণে এসব পাওয়া, তার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার কথা অনালোচিতই থেকে গেলো- এসবকিছু এক দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ সঠিক হলেও এর ভেতরে থেকেই যায় উপকার ভুলে যাওয়ার বিষাক্ততা। শরীয়তওয়ালাকে ভুলে গিয়ে শুধুই শরীয়তের ওপর জোর দেওয়ার কারণে দ্বীন সম্পর্কে একটি শুকনো ধারণা সৃষ্টি হলো। যা কোন রকম মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে পারলো, তবে মনের গভীরে দাগ কাটতে পারলো না। কারণ শরীয়তওয়ালাকে বাদ দিয়ে শুধু শরীয়তের ওপর জোর দিলে শরীয়তসহ হারিয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

একথা মানতেই হবে, যতদিন না ধর্মীয় জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য নবী-প্রেমের আবেগে উদ্দীপ্ত হবে, ততদিন না আমলের স্বাদ পাওয়া যাবে, না ভালোবাসার মধুরতা পাওয়া যাবে। মুবাল্লিগরা সাধারণ ও বিশিষ্ট নির্বিশেষে শরীয়ত ও শরীয়তের অসুরণের কথা আলোচনা করে থাকেন। কিন্তু এমন বয়ান তো

হলো না, যা রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভক্তি-ভালোবাসায় হৃদয়কে বিগলিত করে। যে বয়ানের ভাষ্য শুনে আনন্দ-আহ্লাদ, মিষ্টতা ও সুধা-স্বাদ উপভোগ করে রাসূল-প্রেমের বন্ধন দৃঢ়তর হয়। ইকবালের ভাষায়,

واعظ قوم کی پختہ خیالی نہ رہی – برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی

رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی – فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی

"জাতির বক্তাদের মাঝে নেই আর চিন্তা-শক্তির দৃঢ়তা
বিদ্যুৎসম সাহস নেই, নেই বিবেকজাগানিয়া বক্তৃতা।
আজানের শুধু রসম আছে বটে, বেলালী ভাবের নেই প্রাণময়তা,
দর্শন আছে নামে মাত্র, নেই গাজ্জালীর পাঠন-দক্ষতা।"

ভালোবাসাহীন আমল দিয়ে সৃজিত তাকওয়া, স্বাদহীন ফলের মতো

যতদিন পর্যন্ত রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে মানুষের অন্তরঙ্গতা আবেগোদ্দীপ্ত হবে না, ততদিন মানুষ ঈমানের প্রকৃত স্বাদ উপভোগ করতে পারবে না। শুধুই মাস'আলা ও আহকামের ওপর যান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমল করার ফলে অর্জিত তাকওয়া ও পরহেজগারি, বলতে গেলে, স্বাদহীন ফল। যে-ফলের ভেতরে সুগন্ধি ও সুস্বাদুতা থাকবে না, সেটা বাহ্যিকভাবে যতই সুন্দর হোক, প্রকৃত অর্থে তার কোন মূল্যমান নেই। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি রাসূল-প্রেমের স্বাদ উপভোগ করতে পারবে না, রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গলির কুকুর হতে পারার ওপর গর্ববোধ করবে না এবং কল্পনা-জগতে হলেও তাঁর পাদপৃষ্ঠকে চুমু দেওয়াকে জীবনের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য মনে করবে না, সে হাজার ইবাদতের বোঝাই করলেও ঈমান-ইবাদতের প্রকৃত স্বাদ পাবে না।

ফেতনার সূচনা

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানুষ হওয়ার কথা নিয়ে বাড়াবাড়ির ফেতনা হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবদ্দশায় শুরু হয়েছে। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, এক সময় কিছু গনিমতের মাল আসলো। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সে-মাল সাহাবাদের মাঝে বণ্টন করছিলেন এবং সবাইকে যার যার প্রয়োজন অনুসারে দিচ্ছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে তামীম গোষ্ঠির যুল খুয়াইসর নামক

একজন ব্যক্তি, যার চক্ষু ছিলো কোটরের ভেতর ঢোকানো, মাথায় চুল নেই, মুখের হাড্ডিগুলি স্ফীত-কুশ্রী, লুঙ্গী ছিলো হাটুর ওপর- সে-ব্যক্তি সমাবেশের ভেতরেই দাঁড়িয়ে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে লাগলো,

اعْدِلْ يَا مُحَمَّدُ اتَّقِ اللهَ.

হে মুহাম্মদ ! ন্যায় করো। আল্লাহকে ভয় করো।[৮০]

ন্যায় বিচার-বন্টন চাওয়া সত্য ও শরীয়তসম্মত। কিন্তু হুজুরকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের মতো একজন মানুষ ভাবার কারণে ন্যায়ের কথা তো মনে থাকলো। কিন্তু একথা কি মনে নেই, সামনে কে? আমি কাকে বলছি এই কথা? যেন সে পৃথিবীর বুকে ন্যায়ের প্রধান প্রতিষ্ঠাতার কথা ভুলে গেলো। তার খেয়াল তো তাকওয়ার দিকে গেলো। কিন্তু তাকওয়ার শিক্ষকের কথা ভুলে গেলো। সন্দেহ নেই, ন্যায় ও তাকওয়ার কথা দ্বীনেরই কথা। সে দ্বীনের বিপরীত কোন কথা বলে নি। তবে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শানের বিপরীত বলেছে। যেহেতু রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শ্রদ্ধা তার অন্তরে ছিলো না, তাই তার মুখ থেকে বের হওয়া দ্বীনের কথাও আর দ্বীন থাকলো না। ভাষা দ্বীন ছিলো, তবে ভাষ্য কুফরী। সে যেহেতু হুজুরকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চিনতে পারে নি। তাই 'মানুষ হওয়ার' ধারণায় তাকে ধৃষ্টতায় লিপ্ত হতে হয়েছে। তার দুঃসাহসী ধৃষ্টতা দেখে ফারুকে আ'যম তলোয়ার উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন, এবং বলতে লাগলেন, হে আল্লাহর রাসূল! অনুমিত দিলে আমি তার গর্দান দ্বিখণ্ডিত করে দেবো। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিষেধ করলেন এবং বললেন,

فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

"তাঁর এমন কিছু সাহাবী আছেন, যাদের নামাজ-রোজা দেখে তোমরা নিজেদের নামাজ-রোজাকে খুব ছোট মনে করবে। তারাও কুরআন পড়ে, তবে কুরআন তাদের মর্ম-গভীরে প্রভাব ফেলে না। তাদের বাহ্যিক এসন গুণ-সৌন্দর্য সত্ত্বেও তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমনিভাবে তীর শিকারীকে ভেদ করে চলে যায়।"[৮১]

---

৮০. সহীহ মুসলিম, কিতাবুজ জাকাত, হাদীস নং ১৪২-১৪৪। সহীহ বুখারী, ইসতিতাবাতুল মুরতাদ্দীন, হাদীস নং ৬৫৩৪

৮১. সহীহ বুখারী, কিতাবু ইসতিতাবাতুল মুরতাদ্দীন, হাদীস নং ৬৫৩২, ২৫৩৩৪, ২৫৪১

এই ধরনের ফেতনা প্রথম শতাব্দীর শেষভাগেও কিছু দেখা গিয়েছে। 'খাওয়ারিজ' নামে একটি দল বের হয়েছিলো। যারা ধর্মের ব্যাপারে খুব কঠোর ও কট্টরপন্থী ছিলো। যারা মিথ্যাকে পর্যন্ত কুফরী বলতো। তাহাজ্জুদকে ফরজের মতো বাস্তবায়ন করতো। তারা কঠোর সাধনা করতো। জেহাদ করতো। সব বিচার-আচার কুরআনের হুকুম অনুসারে করতো। এতকিছুর পরও তাদের একটি ভ্রান্ত ভাবনা ছিলো, তারা হযরত আলী ও মুআ'বিয়াকে (রা.) কাফের মনে করতো। তাদেরকে কাফের অ-ঘোষণাকারীকেও কাফের বলতো। যার ফলে তাদের নজরে উম্মতের অধিকাংশ ব্যক্তি কাফের ছিলো। এ কারণেই হযরত আলী (রা.) তাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। তাদেরকে উৎখাত করার জন্য যাবতীয় চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এই ভ্রষ্টতা মুসলমানদের ইতিহাসে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। এক বিশেষ শ্রেণী তাওহীদ ও দ্বীনের আসল তাৎপর্য বোঝার দাবিদার হয়ে মুসলমানদের অধিকাংশকে কাফের, মুশরিক কিংবা পথভ্রষ্ট আখ্যা দিয়ে থাকে। অথচ উম্মতের মুহাম্মদীর অধিকাংশকে পথভ্রষ্ট আখ্যা দেওয়া সেটাই স্বস্থানে একটি ভীষণ ভ্রষ্টতা।

নিজেকে নিয়ে যাও মোস্তাফার দরবারে ...

এই যুগে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে আমাদের গোলামির সম্পর্ক দৃঢ়তর করার প্রথম পদক্ষেপ হলো, তাঁর সঠিক পরিচয় লাভ করা। তাঁর উঁচু মর্যাদা ও বিরল-বিস্ময়কর বড়ত্বের অনুভূতি অর্জন করা। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকার করার ফলে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রেমের সম্পদে সম্পদশালী হওয়াই মুসলিম জাতির জন্য সফলতার চাবিকাঠি। আজকে যদি আমরা সামাজিক ও সামগ্রিকভাবে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রকৃত পরিচয় অর্জন করি, সেই পরিচয় যা কুহাফার ছেলেকে সিদ্দীকে আকবর ও খাত্তাবের ছেলে ওমরকে ফারুকে আ'যম বানিয়েছে। যেই পরিচয় অস্ত্রহীন তিনশ' তেরো জন সৈন্যকে এক হাজার সশস্ত্র বাহিনির ওপর ঐতিহাসিক বিজয় দান করেছিলো। তাহলে সেই পরিচয় এখনো,

فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو
اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی

"বদরের পরিবেশ সৃষ্টি করো, ফেরেশতারা আসমান থেকে
এখনো তোমাদের সাহায্যের জন্য নামতে পারেন দলে দলে।"

পঞ্চম অধ্যায়

অন্তরব্যাধির দ্বিতীয় প্রকারের চিকিৎসা

১। দুনিয়া-ত্যাগ

২। প্রেম-ভালোবাসা

এখন আমাদেরকে দেখতে হবে, হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে কেটে যাওয়া আমাদের গোলামির সম্পর্ক, সেটা কীভাবে পুনরুজ্জীবিত করা যায়। কুরআন-হাদীস, সাহাবা-তাবেয়ীন, আওলিয়া-বুযর্গদের সমস্ত শিক্ষা ও তাদের দিকনির্দেশনার আলোকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে ফলাফল হবে এই, সেই সম্পর্ককে পুনরুজ্জীবিত ও পুনঃদৃঢ় করার একমাত্র উপায় হলো রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভালোবাসার ভিত মজবুত করা।

দুনিয়াবিমুখতার পথ

ভালোবাসার ভিত মজবুত করার এই উপায়টি ছাড়াও আরেকটি উপায় রয়েছে। তবে এটা খুব দীর্ঘ, কষ্টসাধ্য ও কঠিন। এতে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখিন হতে হয় এবং সময়ও ব্যয় হয় বেশি। এটা হলো দুনিয়াবিমুখ ইবাদতকারীদের পথ। তাকওয়া চর্চাকারী ও সাধনাকারীদের পন্থা। এই পথটি সন্দেহাতীতভাবে বড় উঁচু, তবে খুব কঠিন। পক্ষান্তরে প্রেমের পথ খুব বেশি প্রভাবসঞ্চারী, ফলদায়ক ও দ্রুত মনজিলে পৌঁছার উপযোগী। সুলতানুল আরিফীন হযরত সুলতান (রাহ.) বাহু খুব চমৎকার বলেছেন,

"যে-মনজিল পর্যন্ত প্রেমই পৌঁছে দিতে পারে
গাউসদেরকেও সেটা পার হতে হয় খুব কষ্ট করে।
গাউস-কুতুবরাও দৌড়াচ্ছেন এলোমেলো বিভিন্ন দিকে
প্রেমিকরা কিন্তু ঠিকই পার হয়ে যাচ্ছে খুব সহজে।

প্রেমের পথ ও দুনিয়াবিরাগের পথ : দু'য়ের মাঝে পার্থক্য

সত্য সন্ধানের ক্ষেত্রে খোদ কুরআন উল্লিখিত দুই পথ নির্ণয় করে দিয়েছে। সাথে সাথে দু'য়ের মধ্যকার পার্থক্যের কথা স্পষ্টভাবে আলোচনা করেছে। কুরআনের ভাষ্যানুযায়ী এক পথকে 'রাহে ইজাবত' বা আল্লাহকর্তৃক মনোনীতকরণ অন্যটিকে রাহে ইনাবত বা আল্লাহর দিকে পূর্ণ অভিমুখী হওয়া বলে। ইরশাদ হয়েছে,

اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ إِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ إِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ﴿١٣﴾

"আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে পথ প্রদর্শন করেন।"[৮৩]

[৮৩]. সূরা শুরা : ১৩

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা নির্বাচিত করেন এবং নিজের দরবার পর্যন্ত পৌঁছার তাওফীক দিয়ে থাকেন। আয়াতের দ্বিতীয় অংশের অর্থ হচ্ছে, যে আল্লাহ তা'আলার দিকে যাওয়ার ইচ্ছা রাখে, তাকে পথপ্রদর্শন করা হয়। এ দু'য়ের পার্থক্য হলো এই, একজনকে নিজের পক্ষ থেকে নির্বাচন করা হচ্ছে এবং তাকে মনজিল পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অথচ অন্যজন সম্পর্কে বলা হচ্ছে, এটি আমার কাছে আসার রাস্তা। যে ব্যক্তি আমার দিকে আসতে চাইবে, সে যেন এই পথ দিয়ে আসে। এই বাস্তবতাকে পরিস্ফুটিত করা হয়েছে কুরআনে,

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

"যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।"[৮৪]

অর্থাৎ যারা আমাকে চেনা-জানার পথে আমার নৈকট্য অর্জনের জন্য সাধনা করে, তাদের ওপর সমূহ রাস্তা খুলে দিই, যাতে সে নিয়মিত সে-পথে চলতে পারে। কিন্তু অন্যদিকে শুধু পথপ্রদর্শনের কথা নয়, খোদ আল্লাহ তা'আলা তাকে মনোনিত করেন এবং নিজের নৈকট্য দান করে থাকেন। কাউকে শুধু পথপ্রদর্শন করেন, আবার কাউকে হাত ধরে মনজিল পর্যন্ত পৌঁছে দেন।

সুতরাং দুনিয়াবিমুখতা পথ খুবই কষ্টসাধ্য। অথচ প্রেমের পথে মাঝখানে কোন জিনিসের মধ্যস্থতা নেই। সেখানে মাহবুবের করুণাদৃষ্টি বান্দাকে করুণার কোলো তুলে নেয়। এই পথে চলমান ব্যক্তিকে মাহবুব নিজেই মনোনিত করেন। এই পথে এগুলো প্রেমিক হয়ে যায় প্রিয়, প্রার্থনাকারী হয়ে যায় প্রার্থিত, অপেক্ষমান হয়ে যায় অপেক্ষিত। ফলে সম্পূর্ণ সফর এমনিতেই অতিক্রান্ত হয়ে যায়। কবি কি চমৎকার বলেছেন,

عشق کی اک جست نے طے کر دیا قصہ تمام
اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں

"প্রেমের এক ঝাঁপই তো সবকিছু সম্পন্ন করেছে নিমিষে
জমিন-আসমানকে মনে করেছিলাম সীমানার বাইরে"

[৮৪]. সূরা আনকাবূত : ৬৯

অর্থাৎ জমিন-আসমানের দূরত্বকে খুব দীর্ঘ সফর মনে করেছিলাম। কিন্তু যখন প্রেমের গাড়িতে আরোহণ করলাম, দেখলাম এক পা না ওঠাতেই পুরো রাস্তা শেষ হয়ে গেলো। এ কথা অবশ্যই মানতে হবে, প্রেমের যে-গতি ও শক্তি সে-গতি ও শক্তি কিন্তু কোন জিনিসের নেই।

ইকবালের দৃষ্টিতে প্রেমের পথ পাড়ি দেওয়ার উপায়

প্রেমের পথের একজন পথিক কীভাবে দ্রুত গতিতে মনজিলে মকছুদ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, সে ব্যাপারে দার্শনিক কবি ড. ইকবাল চমৎকার আলোচনা করেছেন। তিনি প্রেম, বিবেক ও কৌশলের অবস্থা এবং পরস্পরের তুলনামূল পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন,

"বোয়ালী (রহ) উষ্ট্রীর পদধূলায় হারিয়ে গেলেন
রুমীর (রহ) হাত পালকির পর্দা টেনে রাখলো।
এই নিকৃষ্ট ব্যক্তি যখন তার পেছনে চললো, মুক্তো হয়ে গেলো
একই পথে যখন এই নিঃস্বও মনজিলে পৌঁছার পত নিলো।"

ইকবালের কাছে বোয়ালী সিনা (রহ.) বুদ্ধির প্রতিনিধি। আর মাওলানা রুমী (রহ.) প্রেমের নিদর্শন। রুমীর (রহ.) ওপর এক সময় বোয়ালীর (রহ.) মতো অবস্থা চলেছে। তিনিও স্বযুগের বোয়ালী ছিলেন। কিন্তু শেষান্তে তিনি বুদ্ধি ও যুক্তির পথ পরিহার করে প্রেমের পথে অগ্রসর হলেন।

মাওলানা রুমীর (রহ) ঘটনা

একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা আছে, মাওলানা রুমী (রহ.) নিজের বিদ্যালয়ে পড়ানোর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এক দিন শাহ শামসে তিবরীযী (রাহ.) যিনি আল্লাহপাগল বুযর্গ ছিলেন, কোথায় থেকে ওখানে আসলেন। তিনি মাওলানা রুমীকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী পড়াচ্ছো?

তিনি উত্তর দিলেন, এগুলো তোমাদের জানার বিষয় নয়। এ কথা শুনেই তিনি (শামসে তিবরীযী) কিতাবগুলো তুলে মসজিদের কাছের একটি জলাশয়ে ফেলে দেওয়া শুরু করলেন। মাওলানা রুমী (রহ.) খুব রাগ করে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা আপনি কী করছেন? আমাদের লক্ষ টাকার সম্পদ আপনি নষ্ট করে দিচ্ছেন! শিক্ষক-ছাত্র সবাই হতভম্ব। জ্ঞানের এই ক্ষতি দেখে সবাই অবাক। সবার এই অবস্থা দেখে শাহ শামসে তিবরীযী জলাশয় থেকে এক একটি করে কিতাব বের করা শুরু করলেন। কিতাবগুলো তিনি

তুলছিলেন পানি থেকে। অথচ সেগুলো থেকে বের হচ্ছে মাটি। শিক্ষক-ছাত্র সবাই অবাক বিস্ময়ে হতবাক। তারা তাকে জিজ্ঞাসা করলো, এ কি অবস্থা? তিনি উত্তরে বললেন, 'এগুলো তোমাদের জানার বিষয় নয়।'

এই ঘটনা দেখে মাওলানা রুমীর অন্তরজগৎ আমূলভাবে পাল্টে গেলো। তিনি তৎক্ষণাৎ দারুল উলূমের শিক্ষকতা ও ফাতওয়া লেখার কাজকে চিরবিদায় জানালেন। সেই আল্লাহপাগল বুযর্গ (শামসে তিবরীযী)-এর পেছনে পেছনে নদী-সাগর, উপত্যাকা ও মরূপ্রান্তর ও বন থেকে জঙ্গল সবখানে শাইখের সাথে ঘুরতে লাগলেন। মানুষেরা তাকে অনেক কিছু বলা শুরু করলো। অভিযোগের অভিঘাত ও তিরস্কারের তুফানকে হাসি দিয়ে বিদায় করতে হয়েছে তাকে। মানুষেরা এমনও বলেছে যে, আল্লাহ তা'আলা তার কাছ থেকে হাদীসের খেদমত ছিনিয়ে নিয়েছেন এবং তাকে দ্বীনের খেদমত থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু তিনি এসবকিছু সানন্দে সহ্য করেছেন। কারণ প্রেমের পথে এগুলো শুনতে হয়। প্রেমের পথে নিজের পাথুরে হৃদয়কে ভাঙ্গতে হয়। হযরত খাজা আজমীর (রহ) বলেন,

তিরস্কারের পাথর

"মর্যাদাবোধের কাঁচে তিরস্কারের পাথর ছুঁড়ে মারো।
তাকওয়ার ইজ্জতকে প্রেমের পথে চালিত করো।"

অর্থাৎ গালি ও নিন্দার পাথর দিয়ে নিজের ইজ্জতের শিশাকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দাও। নিজের মহত্বের শিশাকে ভেঙ্গে ফেলো। প্রেমের গলিতে তাকওয়ার ইজ্জতকে চুর চুর করে দাও। তাই মাওলানা রুমী (রহ) যখন নিন্দার পাথর দিয়ে প্রশংসার শিশাকে চুর চুর করে দিলেন, তখনই তার সবকিছু মিলে গেলো। মানুষেরাও বুঝতে পারলো যে, আসল রাস্তা তো এটাই। কবি ইকবাল এই ভাবকে এক কবিতায় চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন,

"তুমি এত সতর্কভাবে বাঁচাবার চেষ্টা করো না এটাকে
তোমার শ্রেষ্ঠ আয়না তো সেটাই,
যা ভেঙ্গে গেলেই বেশি মূল্যবান আয়নাপ্রস্তুতকারীর চোখে।"

এটাই হলো কলবের শিশা, যাকে আমরা সসতর্কভাবে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। এই শিশা শুধু ভাঙ্গতে পারে প্রেমের পথে চলার কারণে। তার ওপর যখন নিন্দা-ভৎসনার পাথর বর্ষিত হয়, তখন মান-সম্মানের শিশা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। আর তখনই অন্তরে আনন্দের অমিয় স্বাদ সৃষ্টি হয়। মানুষি

'আমিত্বের' ভূতগুলো ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়, তখন খোদায়ী রহস্যের সমূহ পর্দা ওঠে যায়।

তার পর মাওলানা রুমী (রহ) লিখেছেন, আলেম তো শুরুতেই ছিলো, তবে আরেফ ছিলো না। খোদার প্রেম এখন তাকে আরেফ বানিয়ে দিয়েছে। যতক্ষণ আলেম ছিলো, ততক্ষণ জানতো। যখন আরেফ হয়ে গেলো, চেনা শুরু করলো। জানা আর চেনার মাঝে পার্থক্য আছে। জানা শুধু বিবেকের কাজ, বিবেকের একটি অবস্থা। অনেক সময় মানুষ জানে, তবে চেনে না। চেনা বলা যাবে তখন, যখন পর্দা ওঠে যাবে। দুনিয়াবিমুখতার পন্থা দিয়েও পর্দা ওঠে যায়, তবে সেটা দীর্ঘ সময় পার হয়ে, খুব কষ্ট করে। অথচ প্রেমের মাধ্যমে সেই পর্দা ওঠে যায় নিমিষে, অনায়াসে। আল্লামা ইকবাল বিবেক ও প্রেমের পার্থক্যটি খুব চমৎকার শৈলীতে বর্ণনা করেছেন,

"বোয়ালী সিনা বুদ্ধির উষ্ট্রীর পদপৃষ্ঠে পিষ্ট হয়ে গেলেন
রুমীই নিজের হাত দিয়ে উষ্ট্রীর জিনের পর্দা টেনে ধরলেন।"

অর্থাৎ বোয়ালী সিনা (রাহ.) দৌড়ালেন। মাওলানা রুমীও (রাহ.) দৌড়ালেন। কিন্তু বুদ্ধি মাহবুবের উষ্ট্রীর পদধূলিতে হারিয়ে গেলো। বুদ্ধি এর আগে অগ্রসর হতে পারলো না। কিন্তু প্রেম অগ্রসর হলো এবং উষ্ট্রীর জিনের পর্দা তুলে দিলো। এই কারণেই ইকবাল অন্যত্র বলেছেন,

گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور-چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے

"আকলের আগে যেতে পারো কিনা দেখো যদি সম্ভব হয়,
কারণ এই আলো তো পথের চেরাগ, মনজিল তবে নয়।"

বিবেক পথ প্রদর্শন করতে পারে। মনজিল তো চেনে না। মনজিল পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া শুধু প্রেমের কাজ।

আল্লাহকর্তৃক মনোনীতকরণ (রাহে ইজাবত) ও আল্লাহর দিকে অভিমুখী হওয়ার (রাহে ইনাবত) মাঝে পার্থক্য

আল্লাহর ভাষ্য মতে 'রাহে ইনাবতের' যাত্রী হলো তারাই, যাদেরকে শুধু পথ দেখানো হয়। পক্ষান্তরে 'রাহের ইজাবতের' পথিকদেরকে মনজিলের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়।

ইনাবতের পথিকদের সঙ্গে ন্যায়ের ব্যবহার আর ইজাবতের পথিকদের সঙ্গে দয়ার ব্যবহার করা হয়। এটা হলো আল্লাহর একান্ত ব্যবহার, যার জন্য কারো পক্ষ থেকে আল্লাহর প্রতি চাপ সৃষ্টির কোন সুযোগ নেই।

আল্লাহ চাইলে দয়াও করতে পারেন, চাইলে ন্যায়ও করতে পারেন। তবে দয়া পাওয়ার জন্য প্রেমের পথে যেতে হবে। প্রেমের পথে যারা চলে, তারা খুবই ভাগ্যবান। তারা এক পা ওঠালেই সম্পূর্ণ দূরত্ব স্বয়ংক্রিয়ভাবেই অতিক্রান্ত হয়ে যায়। তাদের জন্য পথ সহজ ও সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। প্রথম শ্রেণীকে 'মুনীব' বা অভিমুখী বলে। আর দ্বিতীয় শ্রেণীকে 'মুজতবা' একান্ত মনোনীত বলে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ﴿١٣﴾

"আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে পথ প্রদর্শন করেন।"[৮৫]

উক্ত আয়াতে চিন্তা করলে বুঝা যাবে, প্রথমাংশে ইজাবতের ক্রিয়া উল্লেখ হয়েছে। সেই ক্রিয়ায় কর্তা খোদ আল্লাহ। তারপর ইনাবতের কথা বলা হয়েছে। সেখানে কর্তা বান্দা। আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। এখানে উভয় ক্রিয়ার কর্তা হলেন স্বয়ং আল্লাহ। অর্থাৎ মনোনীত করেনও আল্লাহ এবং মনজিলেও পৌঁছে দেন তিনি। এখানে বান্দার উল্লেখ নেই। কারণ মনোনীতকরণ ও মনজিলে পৌঁছে দেওয়া বান্দার কাজ নয় এবং সেটা বান্দার জন্য সম্ভবও নয়। এসবকিছু একমাত্র আল্লাহর কর্তৃত্বে।

অর্থাৎ প্রেমের পথে নিজের ব্যক্তিত্বকে বিলীন করে বান্দা নিজে রাস্তা থেকে সরে যায়। মাঝখানে কোন জিনিস বাকি থাকে না। আল্লাহ তা'আলা নিজেই নির্বাচিত করে নিজের সঙ্গে জুড়ে নেন। সেখানের বান্দার বাসনারও কোন ভূমিকা নেই। يجتبي ক্রিয়াতেও ইচ্ছা আল্লাহর এবং يشاء ক্রিয়াতেও ইচ্ছা আল্লাহর। তবে যুহদ তথা দুনিয়াবিরাগের পথে চেষ্টা বান্দা করে। অর্থাৎ যে বান্দা তাঁর দিকে যেতে চায়, তার জন্য পথ প্রদর্শন করেন। সে পথে চলে পৌঁছার কাজ বান্দার। কারণ 'মুনীবের' কর্তা তো বান্দা।

একটি গুরুত্বপূর্ণ সূক্ষ্ম কথা

এখানে চিন্তার বিষয় হলো- যখন বান্দা নিজে চলে, তখন তার গতি কেমন হয়? আর যখন আল্লাহ বান্দাকে চালান, তখন গতি কেমন হয় ? 'রাহে ইনাবতে' বান্দা নিজে চলে। রাহে ইজাবতে' আল্লাহ বান্দাকে চালান। চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহ একজন বান্দাকে চালানো এবং বান্দা নিজে চলা কি এক সমান হতে পারে? কারণ আল্লাহ তো এক পলকে তিনি যতটুকু চান, অতিক্রম

[৮৫]. সূরা সূরা : ১৩

করাতে পারবেন। বান্দার পক্ষে কি তা সম্ভব? এছাড়াও বান্দা তো মাঝপথে কখনো থমকে যায়। আল্লাহর চলানোর মধ্যে তো আর থমকে দাঁড়ানোর প্রশ্নই ওঠে না। যে ব্যক্তির প্রেমের পথিক হয়ে চলে, তাকে থমকে দাঁড়াতেও হয় না। সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ারও আশংকা নেই তার। সময়ও তার কম লাগে। মনজিলেও পৌঁছুয় খুব সহজে। পক্ষান্তরে যারা 'যুহদের'পথে চলে, তারা থমকে দাঁড়ায়, সময়ও তাদের বেশি যায়, কষ্টও তাদের পৌঁছে যায় চরমতায়। তবু মনজিলে পৌঁছা-না-পৌঁছার মধ্যে শংকা থেকে যায়।

'যুহদের পথ ও 'ইশকের' পথ বুঝার জন্য একটি যৌক্তিক উদাহরণ

'যুহদের পথ ও 'ইশকের' পথ বুঝার জন্য একটি যৌক্তিক উদাহরণ দেওয়া যায়। মনে করুন! আপনার কাছে কিছু জমি আছে। তাতে অপ্রয়োজনীয় খড়কুটো গজেছে। এই জমিকে পরিস্কার করার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। এক. দৈনিক আপনি তিন/চার ঘণ্টা সেখানে কাজ করবেন। পালাক্রমে একটি করে গাছ উপড়ে ফেলবেন। এভাবে দু'একটি গাছ পরিস্কার করতে হয়তো কয়েকদিন লাগতে পারে। মাঝখানে আপনার ক্লান্তিও আসতে পারে। ফলে দু'এক দিন বিশ্রাম করে আরেকটি গাছে হাত দিলেন। এভাবে পালাক্রমে সমস্ত গাছ উপড়ে ফেলবেন। পরিচ্ছন্নকরণের এই পদ্ধতিতে কয়েক মাস ব্যয় হতে পারে। এই পদ্ধতি হলো 'যুহদের' বা দুনিয়াবিরাগের উদাহরণ। এই পদ্ধতিতে কাজ একটু একটু করে জারি থাকে। পরিচ্ছন্নকরণের দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো প্রথম দিনেই আপনি বাজার থেকে তেল এনে গাছ ও খড়কুটোর ওপর ঢেলে দিয়ে আগুণ ধরিয়ে দিলেন। আপনি দেখবেন, সামান্য সময়েই জমি পরিস্কার হয়ে যাবে। এই পদ্ধতি হলো প্রেমের উদাহরণ। এই পদ্ধতিতে পরিস্কার তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। সময়ও লাগে খুব কম।

দুনিয়া ও দুনিয়ার সম্পদের ভালোবাসা, প্রবৃত্তি ও লোভের অসংখ্য খড়কুটো আমাদের অন্তর-ক্ষেতে গজে আছে। যারা 'যুহদের'পথে চলে, তারা চেষ্টা করে, সাধনা করে, নফল পড়ে, তেলাওয়াত করে, বেশি বেশি ইবাদত করে, সর্বদা আনুগত্যে সময় কাটায়। মোট কথা, এ পথে দীর্ঘ জীবন ব্যয় হয়। কিন্তু তারপরও পরিশুদ্ধি নিশ্চিত নয়। অথচ প্রেমের পথে যারা চলে, তারা তেল কিনে আগুণ জ্বালিয়ে দেয়। ফলে সমূহ খড়কুটো মুহূর্তেই জ্বলে ভস্ম হয়ে যায়। তারপর আর কিছুই দেখা যায় না। দেখা যায় শুধু মাহবুবের

নাম। মাহবুবের মুহাব্বত ও তার সাথে অন্তরঙ্গতা ছাড়া সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এ কারণেই প্রেমের সংজ্ঞা এভাবেও দেওয়া হয়েছে,

اَلْعِشْقُ نَارٌ يَحْرُقُ مَا سِوَىٰ الْمَحْبُوْبِ.

"প্রেম সেই আগুণ, যা মাহবুব ব্যতীত অন্য সবকিছু জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়।"

এই পদ্ধতিকেই আমরা নতুন করে প্রাণ দিতে চাচ্ছি। আমরা যা কিছু চেষ্টা-সাধনা করবো, সবকিছুর সারবত্তা হলো আমাদের অন্তরে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভালোবাসা ছাড়া অন্য সবকিছু যেন জ্বলে যায়। আমাদের অন্তরে যেন বাকি থাকে শুধু তাঁরই গোলামির সম্পর্ক। সমস্ত সম্পর্ক যেন ছিঁড়ে যায়। অন্তরে যেন শুধু খুদিত থাকে তাঁরই সম্পর্ক। অন্য সব জিনিস থেকে অনুরাগ কেটে গিয়ে হৃদয়ে যেন তাঁরই অনুরাগ থেকে যায়।

বর্তমানে মানুষ যেভাবে ফেতনা-ফাসাদের শিকার, মানুষের চিন্তা-ভাবনার সজীবতা যেভাবে চুপসে গেছে, ঈমানের চারাগাছ যেভাবে কুঁকড়ে গেছে, হৃদয়ের জমি যেভাবে ময়লায় ভরে গেছে, অবস্থার যেভাবে বিকৃতি ঘটেছে, রূহানী শক্তি যেভাবে শয়তানী শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে- এসব বিপর্যয়ের যথাযথ চিকিৎসা করতে হলে প্রেমের পথ ও পন্থা ছাড়া সম্ভব নয়। এই পথ ছাড়া অন্যান্য পথ এতটুকু পরীক্ষিত ও প্রভাবসঞ্চারী হতে পারে না, যতটুকু হতে পারে প্রেমের পল্লবিত পথ।

তবে আমরা দ্বিতীয় পথটিকে একেবারে ছেড়ে দেই, তা নয়। আমরাও নফল, তাহাজ্জুদ, অজু, যিকির, তাসবীহ ও ইবাদতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করছি। আমরাও ভালো কাজ ও সৎ ব্যবহারের প্রতি জোর দিচ্ছি। তবে আমরা এসব চেষ্টার ওপর ভরসা করছি না। আমরা শুধু প্রেমের ওপরই ভরসা করছি। আমরা যেহেতু উভয় পদ্ধতির ওপর আমল করি, তাই আমাদের আমল উভয় দিকের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

সাহাবাদের কর্মপদ্ধতি

এখন আমরা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখি, সাহাবাদের পবিত্র জীবনে ও তাদের কর্মপদ্ধতিতে কোন দিকটি বেশি উজ্জ্বল ? যুহদের পদ্ধতি না কি প্রেমের পদ্ধতি? এ বিষয়টি আমরা কুরআন-হাদীসের আলোকে জানার চেষ্টা করবো।

হযরত ইমাম মোবারকের (রহ.) একটি বাণী পাওয়া যায়, যেখানে তিনি বলেছেন, এই উম্মতের ক্রান্তিলগ্নে সংশোধনের পদ্ধতি সেটাই বেশি

কার্যকর হবে, যেটা ছিলো সূচনালগ্নেও কার্যকর। আজকে যদি আমরা অবস্থা ও পরিস্থিতি বদলাতে চাই, তো সমস্ত পদ্ধতি বরকতময়। তবে যদি অবস্থা গুরুতরভাবে বদলে যায়, তাহলে সেই পদ্ধতি দ্বারা বদলাতে হবে যেটা নববী পদ্ধতি এবং যেটার ওপর সাহাবা কেরাম আমল করে গেছেন। সাহাবাদের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا ۖ سِيمَاهُمْ فِى وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِى ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

"মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবেন। তাদের মুখমন্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন।"[৮৬]

সাহাবাদের গুণাবলির কুরআনী ক্রমবিন্যাস

এবার আমরা এ আয়াতকে সামনে রেখে চিন্তা করি।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। আয়াতের এ অংশ বুঝাচ্ছে, তোমাদের ঈমানের প্রধান কেন্দ্র হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যাতে মোবারক। তার পর বলেন,

যারা আপনার সাথে আছে। অর্থাৎ সেসব পতঙ্গ যারা এই প্রেম-চেরাগের আশে পাশে ঘুরতে থাকে। সেসব সৌভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গ যারা সর্বদা মাহবুবের দরবারে পড়ে থাকে। যারা মাহবুবের ভালোবাসায় বিভোর থাকে। যাদের সম্পর্ক সরাসরি ঈমানের কেন্দ্রের সাথে। যাদের গোলামি মজবুত এবং যাদের সম্পর্ক শক্ত। তাদের চারটি গুণের কথা বর্ণিত হয়েছে,

أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ

কাফেরদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর।

رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ

পরস্পর কোমল ও সহানুভূতিশীল।

---

[৮৬]. সূরা ফাতাহ : ২৯

تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا

আপনি তাদেরকে সর্বদা রুকু ও সেজদারত দেখবেন।

يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا

আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে।

আমরা এবার চারটি গুণের ক্রমবিন্যাসের ওপর চিন্তা করবো। সাধারণত বান্দাদের শানের যখন আলোচনা হয়, তখন ভালো কাজ, ইবাদত ও আনুগত্যের আলোচনা হয়। বিবেকও সেটা চাই যে, প্রথমে আল্লাহর সন্তুষ্টি, তাসবীহ-তাহলীল, রুকু ও সেজদার আলোচনা হোক। যুহদের পথ ও ইশকের পথ এটাই যে, প্রথমে আল্লাহর সন্তুষ্টি, নিষ্ঠা অর্জিত হোক। তারপর অন্যান্য গুণাবলির আলোচনা। পরস্পর সহানুভূতিশীল হওয়ার কথা। তার পর অনে পরে গিয়ে কাফেরদের সাথে কঠোরতা করার কথা। কিন্তু এখানে গুণাবলির ক্রমবিন্যাসটাই ব্যতিক্রম। প্রথমে মারা ও মরার কথা। তার পর বহু দূর গিয়ে ইবাদত-বন্দেগির কথা। তার কারণটা কী? এটাই মূলত প্রেমের পদ্ধতি। প্রেমের পথে চলমান ব্যক্তি ইবাদত-বন্দেগির কথা অনেক পরে ভাবে। প্রথমেই তারা মাহবুবের শত্রুদের উৎখাত করে দেয়। তার পরই অন্য কাজ। প্রেমের পথে এটাই সর্বপ্রথম কাজ। অথচ এটা প্রাণোৎসর্গকারীদের কাজ। নফল পড়া, নামাজ পড়া, তাসবীহ পড়া, আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা এগুলি খুব সহজ কাজ। কিন্তু তরতাজা প্রাণ বিলিয়ে দেওয়া খুবই কঠিন। নফল যে কেউ পড়তে পারে। মাথা যে কেউ দিতে পারে না। নামাজ-পড়ুয়া ও সাধকপুরুষ ইয়াজীদের সৈন্যদলেও অনেক ছিলো। কিন্তু তীরের নিচে মাথা রেখে দেওয়া হুসাইনের (রা.) কাজ। এটা হলো প্রেমের পরিচয়। প্রেমে প্রথম থেকেই মাথা নেওয়া-দেওয়ার কাজ হয়। প্রেমে প্রথমেই মাথাকে হাতের তালুয় রাখার প্রতিজ্ঞা হতে হয়। যে ব্যক্তি প্রেমের পথে চলে, তার প্রথম থেকেই এই সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে, মাহবুব যদি জানও চায়, দিতে রাজি।

কাফেরদের সঙ্গে কঠোরতা করায় যেহেতু যুদ্ধ ও দ্বন্দ্বের আশংকা রয়েছে এমনি জান পর্যন্ত বিলিয়ে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা থাকতে হয়। তাই বলেছেন, যারা রেসালতের মূল কেন্দ্রের সাথে সম্পর্ক অটুট করতে চায়, তারা যেন প্রেম সৃষ্টি করে। প্রেমের পরিচয় হলো এই, প্রথমে মাহবুবের জন্য মাথা দেওয়ার প্রশিক্ষণ নিতে হবে। যারা রেসালতের কেন্দ্রের সাথে সম্পর্ককে দৃঢ় করতে চায় এবং প্রেমের গাড়িতে আরোহণ করতে চায়, তারা যেন প্রথমেই

সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা মাথা দেওয়ার জন্য রাজি আছে কি না। কুরআন সাহাবাদের গুণাবলি বর্ণনাতে প্রথমেই সেই গুণ বলার কারণ হলো তার সর্বদা মাহবুবের সন্তুষ্টির জন্য মাথায় কাফনের কাপড় বেধেই রাখেন। সাহাবাদের অসংখ্য ঘটনা তার প্রমাণ হিসেবে সাক্ষ্য দান করে।

একজন সাহাবী বিয়ে করলেন। যুবতী ও রমণী স্ত্রী প্রথম বাসরের জন্য অপেক্ষমান। এদিকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জেহাদের ঘোষণা করলেন। বাসরের রাত ছেড়ে সে সাহাবী মাথা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন।[৮৭] এটা প্রেমিকদের নীতি পদ্ধতি। যুহদের নীতি হিসেবে চিন্তা করা যায়, স্ত্রীর হকও তো শরীয়তে বিবেচ্য। সুতরাং তার হক প্রথমে আদায় করে নেই। কিন্তু প্রেমিক এট কখনো ভাববে না। তার কাছে সবচেয়ে বড় হক হলো মাহবুবের জন্য মাথা দেওয়া। মোট কথা উল্লিখিত আয়াতটি রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্ক গড়ে তোলার এবং সম্পর্ককে দৃঢ়তর করার নিয়ম-নীতি বর্ণনা করে দিয়েছে। এই নীতি হলো চার অংশবিশিষ্ট। নফল, তাসবীহ ও সাধনা সে সময়েই কাজে আসবে, যখন সম্পর্ক স্থাপিত হবে। তাই প্রথমে সম্পর্ক স্থাপন করা প্রয়োজন। সম্পর্ক স্থাপন শুধু প্রেমের কারণেই হতে পারে। প্রেমের পরিচয় ও নিদর্শন হলো নিজের ওঠা-বসা, মরা-থাকা একমাত্র মাহবুবের জন্য হয়ে যাবে। দুনিয়ার কোন জিনিস মাহবুব অপেক্ষা প্রিয় থাকবে না। সাহাবাদের আমল তার শক্ত প্রমাণ। একজন মুসলমানের ওপর জেহাদ আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরজ। কিন্তু এমন যেন মনে হয় যে, সাহাবারা রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জন্যই লড়ে যাচ্ছেন। উহুদ যুদ্ধে সাহাবাদের কানে যখন রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শাহাদতের খবর পৌঁছুলো, তখন তাদের হাত থেকে তলোয়ার পড়ে গেলো। ময়দান ছেড়ে এই বলে পালাতে লাগলেন, আমরা যার জন্য যুদ্ধ করছিলাম তিনি তো নেই। এখন আমরা কার জন্য লড়াই করবো? অথচ তারা তো লড়ছিলেন আল্লাহর জন্য। কিন্তু প্রেমের নীতি যখন প্রাধান্য যেয়ে যায়, তখন সবকিছু মাহবুবের জন্য হয়ে যায়। হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখ ইন্তেকাল হলো, হযরত ওমর ফারুক (রা.) তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বলতে লাগলেন, যে ব্যক্তি বলবে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইন্তেকাল করেছেন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেবো। এটাই ছিলো প্রেম যার কারণে বাস্তবের ব্যতিক্রম কিছু হচ্ছিলো। এ অবস্থা

[৮৭]. মুসতাদরিকে হাকিম : খ. ৩, পৃ. ২০৪

দেখে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, পৃথিবীতে অনেক নবী-রাসূল এসেছিলেন। তারা আল্লাহর কাছে আবার চলে গিয়েছেন। তেমনিভাবে আমাদের নবী তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তাতে বিস্ময়ের কী? কিন্তু দেখা বিষয় হলো রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রেমের কারণে তৎক্ষণাৎ সাহাবাদের অবস্থা কী হয়েছিলো? হযরত আবু বকর (রা.) যিনি অন্যদেরকে সবর ও ধৈর্যের শিক্ষা দিচ্ছেন, তার ভেতরের অবস্থা কী ছিলো, সেটা হযরত আয়েশার (রা.) বর্ণনা দ্বারা বুঝতে পারবো।

তিনি (আয়েশা রা) বলেন, সেই কয়েক দিন যখন তিনি এশার পর এবং ফজরের আগে কিছুক্ষণের জন্য আসতেন, তখন হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিচ্ছেদ-বেদনায় তিনি জ্বলতেন। এমনকি তাঁর সীনা থেকে একধরনে আওয়াজ আসতো, যেন হাড়ির ভেতরে গোশত সিদ্ধ হচ্ছে। এটা শুধু আবু বকরের (রা.) অবস্থা নয়, বরং সকল সাহাবার এই অবস্থা ছিলো। সকলের ভেতরেই প্রেমের আগুণ দাউ দাউ করে জ্বলছিলো। এই আগুণ প্রেম-নীতির নিদর্শন ও পরিচয়। এমন অবস্থায় বেঁচে থাকাটা যেন মাহবুবের জন্য বেঁচে থাকা। ভালোবাসা শুধু মাহবুবের জন্য হয়ে থাকে। মাহবুবের প্রেমিকদের সাথেও ভালোবাসা জন্মায়। মাহবুবের দিকে যার শ্যেন দৃষ্টি দিয়ে তাকায়, তাদের চক্ষু বের করার জন্য তারা প্রস্তুত থাকে। মাহবুবের শত্রুদের ব্যাপারে তাদের অন্তর হয় পাথরের মতো কঠিন। আর মাহবুবের বন্ধুদের জন্য তাদের অন্তর হয় একেবারে তুলতুলে তুলার মতো নরম। ইকবালের ভাষায়,

ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم
رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن

"বন্ধু আসরে তাঁরা রেশমের ন্যায় কোমলপ্রাণ
হক বাতিলের দ্বন্দ্বে যেন জগদ্দল পাষাণ"

মাহবুবের শত্রুদের সামনে আসলে বাঘের মতো তর্জন-গর্জনে কাঁপিয়ে তুলতে হবে তাদের হৃদয়। আর মাহবুবের বন্ধুদের সামনে আসলে রেশমের মতো কোমল হতে হবে, হতে হবে মাটির মতো বিনম্র।

সন্দেহ নেই, সাহাবায়ে কেরাম যুহদের ওপরও আমল করতেন। কিন্তু তারা পূর্ণতা অর্জন করেছেন প্রেমের হাত ধরেই। أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ এবং رُكَّعًا سُجَّدًا رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ-এর ওপর আমল হলেই ফায়দা দিতে পারে।

ভালোবাসার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেলে সেটা প্রেম ছাড়া শুধু রুকু-সেজদা দ্বারা জুড়া যায় না। রুকু-সেজদার স্তর তৃতীয় নম্বরে। প্রথমে প্রিয়ের সঙ্গে প্রেমের সুতোয় গেঁথে নিতে হবে। মাহবুব ব্যতীত অন্য সবকিছু অন্তর থেকে বের করতে হবে। আবেগ-অনুভূতির ওপর প্রেমের কর্তৃত্ব দৃঢ় হয়ে গেলে এবং জীবনের সমূহ দিক প্রেমের অনুগত হয়ে গেলেই রুকু-সেজদা কাজে আসতে পারে। অন্যথায় নামাজ-ইবাদত গভীর আনন্দ-মনোযোগ থেকে সম্পূর্ন মুক্ত হবে। কবির ভাষায়,

تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور
ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر

'তোমার ইমাম খুশুহীন,
ফলে তোমার নামাজও স্বাদহীন
এমন নামায থেকে দূরে সরে দাঁড়াও
এমন ইমাম থেকেও দূর হয়ে যাও।'

সাহাবা ও তাবেয়ীনদের অভ্যাস-নীতি ও প্রেম-নীতি

সাহাবাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এই নীতির ওপর অতিবাহিত হতো। এমন অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যাবে, যার মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো যে, সাহাবাদের রগে-রক্তে হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রেম কীভাবে মিশ্রিত ছিলো। হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিচ্ছেদে ও অনুপস্থিতে তারা কি আশ্চর্যরকম অস্থির হয়ে যেতেন ! তারা নিজেদের জীবনের মূল লক্ষ্য হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভালোবাসাকে বানিয়ে রেখেছিলেন।

রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিচ্ছেদ-বেদনায় একজন মহিলার কবিতাপাঠ শুনে হযরত উমর ফারুক (রা.) অসুস্থ হয়ে গেলেন

হযরত যায়দ ইবনে আসলম থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত উমর ফারুক (রা.) সম্পর্কে বর্ণনা করেন। এক রাত্রিতে তিনি সাধারণদের খেদমতের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তিনি দেখলেন, একটি ঘরে চেরাগ জ্বলছে। ঘরে সুতো কেটে কেটে একজন বৃদ্ধা মহিলা কিছু কবিত পড়ছে,

علي محمد صلاة الابرار – صلي عليه الطيبون الاخيار

قد كنت قواما بكا بالاسحار– ياليت شعري والمنايا اطوار

هل تجمعني وحبيبي الدار.

"মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওপর আল্লাহর সকল অনুগত ও নৈকট্যভাজনদের পক্ষ থকে সালাম বর্ষিত হোক।
নিশ্চয় তিনি আল্লাহর স্মরণে দীর্ঘ রাত যাপন করতেন এবং শেষ রাতে অশ্রু নিবেদন করতেন।
আফসোস! মৃত্যুর কারণ তো বিভিন্ন। আমি যদি নিশ্চিত হতে পারতাম যে, কেয়ামতের দিন আমার ভাগ্যে তাঁর নৈকট্য জুটবে।"[৮৮]

এই কবিতাগুলো শুনে হযরত উমরের অন্তরে মাহবুবের স্মরণ এসে গেলো। তিনি জার-জার হয়ে কাঁদা শুরু করলেন। দরোজায় টুকা দিলেন। মহিলা জিজ্ঞাসা করলো, কে?

তিনি বললেন, আমি উমর ইবনে খাত্তাব। মহিলা বললো, এত রাতে উমরের কী কাজ? তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন! দরোজা খুলুন। মহিলা দরোজা খুলে দিলো। হযরত উমর (রা.) তার পাশে বসে কবিতাগুলো আবার পাঠ করার জন্য আবেদন করলেন। সে পুনরায় কবিতাগুলো পাঠ করলো। তখন তিনি বলতে লাগলেন, এই পবিত্র বৈঠকে আমাকেও অন্তর্ভুক্ত করে আল্লাহর কাছে এভাবে দোয়া করো,
'আমরা দু'জনেরই ভাগ্যে যেন জুটে তাঁর নৈকট্য। হে ক্ষমাকারী উমরকেও ক্ষমা করো।'

এই ঘটনার পর হযরত উমর (রা.) কিছু দিন অসুস্থ ছিলেন।

হযরত বেলালের (রা.) মাহবুবের শহর ত্যাগ করার ইচ্ছা

রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইন্তেকালের পর হযরত বেলাল এতই ব্যথিত-বিষণ্ন হলেন যে, তিনি মদিনা ছেড়ে চলে যাওয়ার ইচ্ছা করে ফেললেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) যখন তার ইচ্ছার খবর জানতে পারলেন, তখন তাকে ইচ্ছা থেকে ফিরে আসার জন্য বললেন। তাকে বললেন, তুমি পূর্বের মতো মদিনার মসজিদে আযান দাও। জান্নাতবাসীদের সর্দার ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খাঁটি আশেরকের উত্তর শুনো,

[৮৮]. আশ-শিফা : খ . ২, পৃ. ৫৬৯

إِنِّيْ لاَ أُرِيْدُ الْمَدِيْنَةَ بِدُوْنِ رِسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلاَ أَتَحَمَّلُ مَقَامَ رَسُوْلِ اللهِ خَالِيًا عَنْهُ.

"আমার মাহবুব ছাড়া তাঁর শহরে থাকতে মন চাচ্ছে না। যেখানে আমার মাহবুব নেই, সেই ছন্নছাড়া মরুভূমিতে থাকতে আমার সহ্য হচ্ছে না।"

রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইন্তেকালের পর সকল সাহাবা বিষণ্ন থাকতেন। এমনকি কেউ কেউ হাসা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিলেন। সাহাবাদের দৈনন্দিন অভ্যাস-নীতি ও কর্মসূচী একথার সাক্ষী দেয় যে, রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভালোবাসা তাদের দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়েছিলো।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) একদিন নিজের উষ্ট্রীকে এক খোলা মরুভূমিতে ঘোরাচ্ছিলেন। এক ব্যক্তি দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। অকারণে খালি জায়গায় উষ্ট্রী ঘোরাচ্ছেন কী জন্য? তিনি বললেন কারণ আমারও জানা নেই। তবে রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই জায়গায় উষ্ট্রী ঘোরাতে দেখেছি। আমিও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।[৮৯]

কবির ভাষায়,

مری زندگی بھی عجیب ہے، مری بندگی بھی عجیب ہے

جہاں مل گیا ترا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا لیا

"আমার জীবন এক বিস্ময়, বন্দেগি সে তো আরেক বিস্ময়
যেখানেই পাওয়া গেছে তোমার পদচিহ্ন,
সেখানেই নির্মাণ করেছি কা'বা।"

হযরত উসমানের (রা.) আমল

হযরত উসমান (রা.) সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে, তিনি এক সময় অজু করে মুচকি হাসলেন। সেখানে অন্য কেউ ছিলো না। তিনি একাকী ছিলেন। একজন ব্যক্তি তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন আপনি একাকী হাসছেন ? উত্তরে তিনি বললেন, একদিন আমি হুজুরকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দেখলাম তিনি এই জায়গায় অজু করে দাঁড়িয়ে তিনি মুচকি হাসছিলেন। তাঁর স্মরণে ও পদাঙ্ক অনুসরণে আমিও হাসছি এবং মাহবুবের সুন্নতের ওপর আমল করছি। সাহাবায়ে কেরাম হুজুরকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

[৮৯]. আশ্ শিফা : খ.২, পৃ. ৫৫৮

কত ভালোবাসতেন, সেটা কোন দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যাবে না। হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সামান্য ইঙ্গিতে-সংকেতেও জান বিলিয়ে দেওয়া ও মাল ঢেলে দেওয়া তাদের আদর্শ ছিলো।

সিদ্দীকে আকবর (রা.) ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভালোবাসা

সিদ্দীকে আকবরের (রা.) উৎসর্গ-আবেগ দেখলে অবাক হতে হয়। তাবুকের যুদ্ধের সময় যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জেহাদের জন্য মাল-আসবাব নিয়ে আসার আদেশ দিলেন, তখন সকল সাহাবা সাধ্যানুযায়ী মাল-সম্পদ নিয়ে আসলেন। হযরত আবু বকর (রা.) ঘরের সমস্ত সামান নিয়ে উপস্থিত। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟

"পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছো?"
তিনি উত্তরে বললেন,

أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللهَ وَرَسُولَهُ!

"আমি পরিবারের জন্য আল্লাহ ও রাসূলকে রেখে এসেছি।"[৯০]

এটাই হলো প্রেম। মাহবুবের যখন সম্পদ দরকার হয়েছে তো সমূহ সম্পদ দিয়ে দিলো। মাহবুব জেহাদের জন্য ডাক দিয়েছেন তো বাসরের রাতকে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে জেহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

প্রেম-নীতি ও সিদ্দীকী আদর্শ

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) হিজরতের সময় যখন নিজের মাল-সম্পদ, সন্তান ও পরিবারকে বিদায় দিচ্ছেন, তখন তিনি নিশ্চয় জানতেন, তিনি চলে যাওয়ার পর তাদের ওপর কী করুণ পরিস্থিতি ঘটবে। কিন্তু প্রেমের একক সিদ্ধান্ত হলো মাহবুবকে একাকী ছেড়ে দিতে নেই। অতঃপর সিদ্দীকে আকবর পদে পদে কী বিরল প্রাণনাশী পরিস্থিতির সম্মুখীন, তা চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে ইতিহাসের পাতায়। কারণ ইতিহাসে তার কোন জুড়ি নেই।

[৯০]. সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুয্ যাকাত, হাদীস নং ১৬৭৮। সুনানুত তিরমীযী, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস নং ৩৬৭৫

রাস্তায় 'গারে সাওরে' পৌঁছে যখন হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিশ্রামের সময় হলো, তখন প্রথমে গর্তে ঢুকে গর্ত পরিস্কার করে দিচ্ছেন। গর্তে কিছু ছিদ্র নজরে পড়লো, সেগুলোকে নিজের পাগড়ি মোবারক ছিঁড়ে বন্ধ করে দিচ্ছেন, যাতে কোন কষ্টদায়ক জিনিস মাহবুবকে কষ্ট দিতে না পারে। একটি ছিদ্র থেকে গেলো, সেটাকে নিজের পায়ের গোড়ালি দিয়ে বন্ধ করে দিচ্ছেন। আর এদিকে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার রানে শুয়ে আরাম করেন। একটি সাঁপ কোন দিকে থেকে পথ না পেয়ে যে দিকে গোড়ালি ছিলো সেদিকে পায়ে কামড় বসানো শুরু করলো। সাঁপের কামড়ের ব্যথায় হযরত আবু বকরের চেহারা পর্যন্ত কাল হয়ে যাচ্ছে, তবু তিনি নিজের রান নড়তে পর্যন্ত দিচ্ছে না মাহবুবের কষ্ট হবে ভয়ে। এসব ত্যাগ একমাত্র প্রেমিকরাই দিতে পারে।

হযরত আলী (রা.) ও রেসালতের সাথে তাঁর আদব

হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর জানুতে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছিলেন। এদিক আছরের নামাজ কাযা হবে বলে মনে হলো। কারণ সূর্য একেবারে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিলো। হযরত আলী (রা.) চক্ষু দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হওয়া শুরু হলো। যেহেতু মাহবুব বিশ্রাম নিচ্ছেন, তাই নামাজ কাযা হলে হোক, মাহবুবের আরামে ব্যাঘাত ঘটানো যাবে না।

সাহাবাদের যে কারো জীবনের দিকে নজর করা যাক না কেন, সবার অন্তরকে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রেমে ভরপুর দেখা যাবে। তাদের জীবনের সারকথা ছিলো রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে প্রেম-ভালোবাসা। কবির ভাষায়,

"শুরুতে প্রেম, শেষে প্রেম, প্রেম সবদিকে
প্রেম আছে গাছে-ডালে, আছে প্রেম ফুলে-ফুলে"

একারণেই রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে সাহাবাদের সম্পর্ক খুব গভীর ছিলো। যে ঘনিষ্ঠতা প্রেমের পথে আসে, সেটা খুব শক্ত ও টেকসই হয়। কিন্তু বিবেকের ভেলায় চড়ে কোন সম্পর্ক আসে, সেটা খুব বেশি দিন টিকে না। কারণ বিবেকের চাহিদা হলো স্বার্থচিন্তা। প্রেমই শুধু অন্ধ আনুগত্য ও অনুকরণের চাহিদা পূরণ করতে পারে। কিন্তু বিবেক কোন দিনই এই সফরে সঙ্গী হতে পারে না।

عقل کو تنقید سے فرصت نہیں- عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ

"সমালোচনার আঘাত থেকে আকলের কোন মুক্তি নেই
কাজ কিছু করতে হলে প্রেমের ভিত্তির ওপর করতে হয়"
নির্দ্বিধায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে প্রেম নামরুদের আগুণে
আকল তো এই তামাশা দেখে অস্থির, সে এটা বুঝে ওঠে কোন গুণে।"

অর্থাৎ আকল তো চিন্তা করছিলো, জ্বলন্ত আগুণে ঝাঁপ দেবো কি না? কিন্তু ইশক তো ঝাঁপ দিয়েই দিলো। তাই বুঝা গেলা, যে সম্পর্ক প্রেমের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, সেটা খুব শক্ত ও টেকসই হয়। রেসালতের কেন্দ্রের সাথে সাহাবাদের সম্পর্ক প্রেমের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। তাঁদের পুরো জীবন কেটেছে প্রেমের ওপর। সাহাবাদের পরে অলী-বুযর্গরা সেই পথকেই সজ্জিত করেছেন। শহীদরাও এই পথে চলেই বিগত হয়েছেন। একারণেই তাঁরা সবাই চিরজীবন্ত হয়ে আছেন। কবির ভাষায়,

"তাসলীমের তলোয়ারে নিহতদের জন্য
সর্বদা অন্য আরেকটি প্রাণ রয়েছে গায়ব থেকে।"

অর্থাৎ যারা তাসলীমের তলোয়ার দ্বারা নিহত হয়েছে, তাদের প্রতিটি মুহূর্তে কোন না কোন নতুন প্রাণ মিলতেই থাকে। তামার কখনো মরে না। তারা চিরদিন থেকে যান অমর-অক্ষয়। কবির ভাষায়,

"যারা কলিজার ক্ষতকে চুমু খেতে শিখেছে,তারা সফল হয়েছে।"

সারকথা

সারকথা হলো যদি আমরা চাই, রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গোলামির সম্পর্ক পুনরায় স্থাপিত হোক, হোক আরো দৃঢ়তর, তাহলে যুহদ, ইবাদত ও সাধনার পথও ধরতে পারি। তবে মনে রাখতে হবে, ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্ক জোড়া দেওয়ার জন্য সর্বাধিক কার্যকর উপায় হলো প্রেমের পথ।

আমাদের পদ্ধতি হলো প্রেমের মাধ্যমেই রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভালোবাসাকে দৃঢ় করা যাবে। আর এটাই হলো কুরআনী নীতি। যেখানে মাথা দেওয়ার কথা আগে। তারপর অন্যান্য কিছু। এই পদ্ধতির প্রেক্টিকেল চিত্র হলো অধিক পরিমাণে সালাত ও সালামের মাহফিল অনুষ্ঠিত করা। হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রূপসৌন্দর্য ও গুণসৌন্দর্যের আলোচনা করা। হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

স্মরণের মাধ্যমে অন্ধকার অন্তরকে আলোকিত করার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া। অধিক হারে নাতের অনুষ্ঠান করে এমন একটি ভাব সৃষ্টি করতে হবে যে,

نعت پڑھتا رہوں، نعت سنتا رہوں–آنکھ پر نم رہے، دل مچلتا رہے

"নাত পড়তে থাকবো, না'আত শুনতে থাকবো
যাতে আঁখি অশ্রুসজল থাকে, অন্তর থাকে আবেগে ভরপুর।"

রূহানী গভীরাবস্থা সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করতে হবে, যতক্ষণ না আমাদের মৃত অন্তরকে জীবিত করা যায়। কুঁকড়ে যাওয়া রূহকে সজীব করা যায়। কলিজার রক্ত দিয়ে ঈমান-উদ্যানে পানি সেচ করা যায়। দুনিয়ার ভালোবাসাজনিত অন্তরের ময়লা-আবর্জনাকে পরিস্কার করা যায়। হৃদয়ের জমিতে প্রবৃত্তি দুনিয়াপ্রীতির কারণে গজে ওঠা খড়কুটোকে প্রেমের তেল ও আগুণ দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া যায়। যাতে হৃদয়-গভীরে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই না থাকে।

আল্লাহ যেন আমাদের তাওফীক দান করেন, যাতে আমরা প্রেমের পথকে জীবনের আসল কাজ বানিয়ে নিতে পারি। নিজের অন্তরে জীবিত করতে পারি রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রেম ও ভালোবাসা। আমাদের হৃদয়ের গভীরে পুষে রাখতে পারি শুধু তাঁরই ভালোবাসা। সেই প্রেম ও ভালোবাসার উদ্যান যেন দিনে দিনে ভরে ওঠে ফলে-ফুলে-পাতাবাহারে। আমীন ! সুম্মা আমীন!

"অন্তর-গভীরের হে পুলকিত প্রেম !
তোমাকে শত স্বাগতম!
সব অসুখের মহৌষধ তুমি, তুমি সকলের উত্তম।"

সন্‌জরী পাবলিকেশন্স প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

১. শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী রচিত 'হাকীকতে তাসাওউফ'-এর বাংলা অনুবাদ **'তাসাউফের আসল রূপ'**

২. শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী রচিত এশ্‌কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম'-এর বাংলা অনুবাদ **'এশ্‌কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম'**

৩. শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী রচিত 'ফাসাদে কল্‌ব অওর উন্‌কা ইলাজ'র বাংলা অনুবাদ **'আত্মার বিপর্যয় ও তার প্রতিকার'**

৪. শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী রচিত 'তা'লীমাতে ইসলাম (ঈমান)'-এর বাংলা অনুবাদ **'ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা (ঈমান)'**

৫. শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী রচিত 'ইসলাম মে খাওয়তীন কে হুকুক'-এর বাংলা অনুবাদ **'ইসলাম ও নারী'**

৬. দিল্লীর প্রখ্যাত লেখক ড. জহুরুল হাসান শারেব রচিত 'দিল্লী কা বাইছ খাজা'-এর বাংলা অনুবাদ **'দিল্লীর বাইশ খাজা'**

৭. পীরজাদা সিরাজ মাদানী নিজামী সাইয়্যেদ বুখারী সংকলিত **'শামসুল মাশায়েখ হযরত পীর জামিন নিজামী সাইয়্যেদ বুখারী (রাহ.)-এর জীবন থেকে'**

৮. পীরজাদা সিরাজ মাদানী নিজামী সাইয়্যেদ বুখারী রচিত ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হযরত নিজাম উদ্দীন আউলিয়ার **'মকবুল দো'আসমূহ'**

৯. প্রখ্যাত আলেমে দীন ড. আসলাম প্রণীত 'শানে রাসুল বযবানে হক'-এর বাংলা অনুবাদ **'খোদার ভাষায় নবীর মর্যাদা'**

লেখক পরিচিতি



বর্তমান যুগের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আলকাদেরী পাকিস্তানের জং শহরে ১৯৫১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম স্থানে পাস করে নতুন এক রেকর্ড স্থাপন করেছেন। তিনি এই সুবাদে গোল্ড মেডেল অর্জন করেন। উল্লেখযোগ্য নাম্বার পেয়ে তিনি একই ইউনিভার্সিটি থেকে এল.এল.বি পাস করেন । ১৯৮৬ সালে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি তাঁকে 'ইসলামে শাস্তি : এর প্রকার ও দর্শন' শীর্ষক বিষয়ের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেছে।

তিনি মুসলিম বিশ্বের মহান রূহানী ব্যক্তিত্ব , ওলীদের আদর্শ পুরুষ সাইয়িদুনা তাহের আলাউদ্দীন আল-কাদেরী আল-বাগদাদী (রহ) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। তাঁর কাছ থেকে তরীকত ও তাসাউফ-এর দীক্ষা ও ফায়য অর্জন করেছেন। হযরতের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণের মধ্যে রয়েছেন স্বয়ং তাঁর পিতা ড. ফরীদুদ্দীন কাদেরী, মাওলানা আবদুর রশীদ রেজভী, মাওলানা জিয়াউদ্দীন মাদানী,মাওলানা আহমদ সাঈদ কাজেমী, ড. বোরহান আহমদ ফারুকী এবং শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আলূনী আল-মালেকী আল-মক্কী রহ. এর মতো প্রখ্যাত আলেমগণ।

তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত পুরো পাকিস্তানব্যাপী 'উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায়' প্রথম হয়ে 'কায়েদে আ'জম গোল্ড মেডেল' অর্জন করেছেন। এ ছাড়াও তিনি অর্জন করেছেন আরো অনেকগুলি গোল্ড মডেল। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির এল.এল.বি বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। এ ছাড়াও পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির সেন্ট,সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি একই সঙ্গে পাকিস্তান শরয়ী আদালতের ফিকহ উপদেষ্টা,পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টা,ইসলামি পাঠ্যক্রম জাতীয় কমিটির দক্ষ সদস্য,আ'লা তাহরীক মিনহাজুল কুরআনের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক,পাকিস্তান আওয়ামী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সভাপতি, আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্মলনের সহসভাপতি,আন্তর্জাতিক ইসলামি একতা সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল,পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সাবেক সদস্য এবং উনিশটি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলবিশিষ্ট সংগঠন 'পাকিস্তান আওয়ামী ইত্তেহাদ' এর সভাপতি। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন আধুনিক ও প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রখ্যাত বিদ্যাপিঠ 'মিনহাজুল কুরআন ইউনিভার্সিটি ,লাহোর'।

উর্দূ,আরবি ও ইংরেজী ভাষায় এ পর্যন্ত তিন'শর ওপরে তাঁর রচিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে। বিচিত্র বিষয়ে রচিত তাঁর আটশতাধিক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রকাশের পথে রয়েছে।

মানবকল্যানের কারণে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক, চিন্তানৈতিক ও সামাজিক খেদমতকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নিম্নে আমরা তার কিছু নমুনা পেশ করছি :

১. গবেষণা, রচনা এবং মানবকল্যাণের লক্ষ্যে আত্যন্তিক প্রচেষ্টার জন্য দ্বিতীয় মিলিনিয়ামের শেষ প্রান্তে পৃথিবীর পাঁচশত প্রভাবশালী প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২. 'আমেরিকান বায়ুগ্রাফিকেল ইনিস্টিটিউট' (ABI)-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজের অসাধারণ সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ International Whos who of Contemporary Achievement 'সমকালীন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব পুরস্কার'-এর পঞ্চম এডিশনে ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরীর ওপর একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়ছে।

৩. 'আমেরিকান বায়ুগ্রাফিকেল ইনিস্টিটিউট' (ABI)-এর পক্ষ থেকে পৃথিবীর সবচে' বড় বেসরকারি শিক্ষাপ্রকল্প বাস্তবায়ন, দুইশ গ্রন্থের লেখক হওয়া , পাঁচ হাজারের অধিক বিষয়ের ওপর বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ও সংগঠনে বক্তৃতা উপস্থাপন করা , 'মিনহাজুল কুরআন আন্দোলন'এর প্রতিষ্ঠাতা এবং 'দি মিনহাজ ইউনিভার্সিটির' চ্যান্সেলর হওয়ার সুবাদে The International Cultural Diploma of Honour আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ডিপ্লোমা অব অনার্স- উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

৪. ইংল্যান্ডের ইন্টারনেশনাল বায়ুগ্রোফিক্যাল সেন্টার অব কেম্ব্রিজ- (IBC) এর পক্ষ থেকে শিক্ষা ও সমাজের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী কৃতিত্বের স্বাক্ষর স্থাপনের সুবাদে তাকে The International Man of the Year 1998-99 '১৯৯৮-৯৯ সালের আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

৫. বিংশ শতাব্দিতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসাধারণ সেবা করার জন্য তাকে Leading Intellectual of the World 'বিশ্বের মহান বুদ্ধিজীবি ব্যক্তিত্ব- এর উপাধি প্রদান করা হয়েছে।

৬. শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে তার অদ্বিতীয় খেদমতের জন্য International Who is Who -পক্ষ থেকে Individual Achievement Award 'অনন্য ব্যক্তিত্ব পুরস্কার' প্রদান করা হয়েছে।

৭. নজীরবিহীন গবেষণার কারণে (ABI) এর পক্ষ থেকে Key of Success 'সফলতার চাবিকাঠি'র সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।

৮. বিংশ শতাব্দির International Who is Who এর পক্ষ থেকে Certificate of Recognition 'যোগ্যতার স্বীকৃতি সনদ' প্রদান করা হয়েছে।

সন্দেহাতীতভাবে শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী একজন ব্যক্তি মাত্র নন; বরং তিনি মুসলিম উম্মার জন্য একটি নতুন যুগের প্রতিষ্ঠাতা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যোগ্য প্রতিনিধি।

সবুজপত্র পাবলিকেশন